সাহিত্য মালিকা

কবিতা মঞ্জরী

চিরসখা	শ্রীমতী দেবযানী (মালা) রায়
স্বপ্ন দেখো	দীপংকর চক্রবর্ত্তী
আমার মুক্তি	সুপ্তি বসু
অন্তর্যামী	উত্তম কুমার বণিক
মেঘ ও রোদ্দুর	দীপংকর চক্রবর্ত্তী
ভালোবাসা	জয়শ্রী কুন্ডু (রক্ষিত)
মা	শ্রীমতী শাশ্বতী জানা
মহিষাসুরমর্দিনী	শ্রীমতী শাশ্বতী জানা
ঘুমপর্ব	স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়
সেবা মা	অনামিকা দাস
নাটকের গল্প	সৈকত মিত্র

গল্পগুচ্ছ

কাণ্ডজ্ঞান	পুণ্যজিৎ গুপ্ত
নারীর অধিকার	শ্রীমতী শুক্লা দে
অপেক্ষা	দিলীপ চক্রবর্ত্তী
একটি নারীর দৃষ্টিতে দুই কবি	অনিমা গুপ্ত
মায়াবী কাঞ্চনজঙ্ঘা	উত্তম কুমার বণিক
টিকটিকি	স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

রান্নাঘর

চিকেন ইজিপ্সিয়ান কাবাব	শ্রীমতী দেবযানী (মালা) রায়
স্টিম চিকেন উইদ্ মাশরুম	জয়শ্রী কুন্ডু (রক্ষিত)

চিরসখা

শ্রীমতী দেবযানী (মালা) রায়

"ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে" আধো গলায় গান,
সেই যে শুরু পথ চলা মোর সাথে নিয়ে তান।
"আজ ধানের খেতে" "বাদল বাউল" প্রকৃতিকে চেনা,
"আকাশ ভরা সূর্য তারায়" বিশ্বকে মোর জানা।
"আমরা সবাই রাজা" গানটি ধরি, বয়স আমার ছয়,
প্রথম পুরষ্কার গ্রহণ করি কি যে আনন্দ হয়।
একক পরিবেশন রবীন্দ্রজয়ন্তীতে তখন আমি সাত,
"আলো আমার আলো" গানে সবাই কুপোকাত।
রবিদাদুর গান জানি, আর জানি বীর পুরুষ,
রবীন্দ্রনাথ কে তখনও জানি না তার নামেই আমি খুশ।
যখন বয়স আমার দশ -
"তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে" মহোৎসবে গাই,
বাবার সাথে ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজে যাই।
"এইতো তোমার আলোকধেনু" বাজে আমার কানে,
চলা সেথায় শুরু আমি আজও মগ্ন রবীন্দ্রনাথের গানে।
তখনও 'রবীন্দ্রনাথ' নয়, রবিদাদুই আমার প্রিয়জন,
মাত্র একটি শব্দ 'গীতবিতান' শুনেই জাগে শিহরণ।
"পাগলা হাওয়া""মোর বীণা""মম চিত্তের" সাথে নাচ,
বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে কথা বড় মনে পড়ে আজ।
'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' 'শ্যামা' চিত্রনাট্য,
'শাপমোচন' 'কালমৃগয়া' আরও কত গীতিনাট্য।
কখনও নাচে কখনও গানে করেছি অংশগ্রহণ,
পেয়েছি অনেক পুরষ্কার ও বহু অভিনন্দন।

'ভানুসিংহের পদাবলী' তে আমার নৃত্যরত রাধা,
আজও জানায় অনেকেই 'ভুলিনি সে কথা'।
কলকাতায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান,
বিখ্যাত তার শিক্ষা - পদ্ধতি নাম তার 'গীতবিতান'।
সেখাম থেকেই গীতভারতী উপাধি আমি পেলাম -
রবীন্দ্ররচনাবলী হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম।
দশ বছরের সঙ্গীত - শিক্ষা হল আমার শেষ,
তার সৃষ্টির শিল্প ভাণ্ডার যে অফুরন্ত অশেষ।
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর পথে আমার যাত্রা হল শুরু,
সাথে সুচিত্রাদি, মায়াদি, সুবিনয়দা, পূরবীদি
তারা হলেন আমার ব্যাক্তিগত শিক্ষাগুরু।
রবিগানকে জানতে হলে জ্ঞান চাই রাগ সঙ্গীতে,
অমিয়দা, নীহার- দার (অমিয়রঞ্জন ও নীহাররঞ্জন বন্দোপাধ্যায়) কাছে
গেলাম তালিম নিতে।
কত বাণী, কত ছন্দ, কত সুর, কত লয় -
জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাই তার গানই মনে হয়।
'আমি কেবলই স্বপন' আমার কণ্ঠে প্রথম বাজে
যেদিন আকাশবাণীতে গান -
আমার পরিচিত জনে বয়ে যায় যেন
এক অসীম আনন্দের বান।
তাঁর গানকে তো কেবল ভালোবাসি না - ভালোবাসি তাঁকেই,
তাঁর লেখা, তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর আঁকা
ওই দিব্যকান্তি, দীপ্তকণ্ঠ, সেই মহামানবটিকে।

চিরসখা (কবিতার শেষ অংশ)

শ্রীমতী দেবযানী (মালা) রায়

"বিশ্ব- বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে" দেখি বিশ্বকবিরে
তাঁরে আমি শুধাই হে প্রিয়, তুমি কবে আসিবে ফিরে?
আজও শেষ হয়না যে তোমার গান গাওয়া,
তোমার গানই শেখাই বোঝাই,
লাগিয়ে পালে উতল হাওয়া।
রবিদাদু থেকে কবে যে হলে আমার রবীন্দ্রনাথ,
স্বপনে জাগরণে সদা পাই আমি তব আশীর্বাদী হাত।
তোমার গানে সেই যে আমার পথ চলা শুরু –
তুমিই আমার ধ্যান জ্ঞান আমার পরমগুরু।
আমার মালঞ্চে তাই আজ কত ফোটে ফুল,
তোমায় এত ভালোবাসি – সে কি আমার ভুল?
তবে কেন আজও আমি পাই না তোমার নাগাল,
কৃপাদৃষ্টি রাখো হে প্রিয়, আমি যে বড় কাঙাল।
তোমার শব্দচয়নে তাই তোমারে জানাই প্রণাম,
জানাই আমার প্রশ্ন ও আকুণ্ঠ আহ্বান।
"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
তুমি ধরায় আসো?
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো
ধরায় আসো"।।

*****

স্বপ্ন দেখো

দীপংকর চক্রবর্ত্তী

স্বপ্ন দেখো,
স্বপ্ন ছাড়া জীবন হয়ে যায় যান্ত্রিক,
স্বপ্ন ছাড়া
আগামী কাল গুটিগুটিপায়ে এগিয়ে আসে
কোন নুতন আশার আলো বহন না করেই।

চিত্রকরের স্বপ্ন ফুটে ওঠে তার ছবিতে,
কবির স্বপ্ন প্রস্ফুটিত হয় কবিতায়
বিজ্ঞানীর স্বপ্ন চরিতার্থ হয় নব নব আবিষ্কারে,
সাধারন মানুষের স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে
তার দৈনন্দিন নব নব প্রচেষ্টায়।

মানুষ পূর্ণতার স্বপ্ন দেখে
যদিও পূর্ণতা এক মরিচীকা
অথবা এক অবিরাম খোঁজ।

এইভাবেই এগিয়ে চলে মানবজাতি
অব্যহত থাকে তার অগ্রগতি।

*****

আমার মুক্তি

সুপ্তি বসু

বন্ধ জানলাটা খুলতেই
পূবের আকাশের একমুঠো রোদ্দুর
চোখে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তেই
মনে হলো শুরু হলো বৈশাখের।

চলছে এখন কবিপক্ষ, কবির জন্মদিন
তুমি সুর, আমি গান
তুমি আছো মনে প্রতিক্ষণে, প্রতিদিন
তোমাতেই নিবেদিত প্রাণ।

সামনে খোলা গীতিবিতান
"এই আকাশে আমার মুক্তি"
সত্যিই কি মুক্ত এই জীবন?
পুরুষ শাষিত সমাজ মানে না
কোন যুক্তি
তোমার লেখনীতে পেয়েছি
আমার মুক্তি।

তুমি বিশ্ব কবি
তোমার কবিতা গান
বাঁচিয়ে রেখেছ আমার প্রাণ,
"তুমি রবে নীরবে"
আছ আমার এই হৃদয় মাঝারে।

ফুলের মালায় তুমি
নও শুধু ছবি
তমসাঘন রাত্রিকে দিয়েছো
উষার আলো,
অনেক দুঃখীকে করেছো সুখী,
হে কবি,
তোমার আশীষে সবারে রেখেছো ভালো।

তুমি শুধু নও একটি
মাসের কবি
"হে নূতন দেখা দিক আরবার
জন্মের প্রথম শুভক্ষণ"
মনের মধ্যে থাকবে
চিরনূতনের ছবি।
তোমার পায়ে অর্ঘ সাজিয়ে
রাখবো প্রতিক্ষণ।
তোমাতেই মুক্তি, তোমাতেই শান্তি,
"বরিষো ধরা মাঝে, শান্তির বারি।

*****

অন্তর্যামী

উত্তম কুমার বণিক

কে বলে তুমি নাই?
তুমি যে আছ,
আমার হৃদয় মাঝে
ভুলি কি করে তাই?

পাই না ভেবে কোন কুল,
কর কি করে সব সমস্যার সমাধান
এত নিপুণতার সাথে?
হয়না যে কখন, এতটুকু ভুল!

পাই যে সব কিছু,
চাওয়ার আগেই,
তাইতো হারাতে চাই না
তোমার পিছু।

সুখে- দুঃখে জুগিয়েছ মনে
আশার আলো আর অনুপ্রেরণা
তুমি যে অন্তর্যামী,
বুঝতে পারি তা সর্বক্ষণে।

*****

মেঘ ও রোদ্দুর

দীপংকর চক্রবর্ত্তী

চেয়ে ছিলাম জানালা দিয়ে
খন্ড খন্ড মেঘে ভরে দিলো আকাশ,
স্তিমিত আলোয় দূরে মেট্রোরেলের পথ
হয়ে এলো আবছা,
প্রকৃতির বিষণ্নতার সাথে সাথে
মনে ভিড় করে এল কিছু রোগক্লিষ্ট ম্লান মুখ,
কিছু অতৃপ্তি, কিছু বিচ্ছেদ,
জীবনের অনিশ্চয়তা।

হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে রোদ্দুর
ঝলমলে আলোয় গাছ গাছালির নাচ
কোকিলের গান, নীল আকাশের হাতছানি।
মনে নুতন আশা, উদ্যম,
আনন্দ অনুভব।

*****

ভালোবাসা

জয়শ্রী কুন্ডু (রক্ষিত)

ছবি তুমি এতো স্থির কেন?
দেখো চেয়ে আমি তোমার প্রিয়তমা
এসেছি দূয়ারে তোমার
কথা কও, কথা কও প্রিয়
থেকোনা মুখ ফিরায়ে
চেয়ে দেখো মোর পানে
তব সম্মুখে আমি এক সাধারণ নারী
ভালোবেসে তোমারে করেছি
প্রাণ মন সমর্পণ
তোমার সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার কানে আসে
চোখ বুজলেই তোমার গায়ের গন্ধ অনুভব করি
তোমার গলায় রবি ঠাকুরের গান কতদিন শুনিনি
আজ খুব শুনতে ইচ্ছে করছে
তুমি আমাকে বলেছিলে আমি তোমার বীর প্রেমিক
দেশের কাজে যাচ্ছি এখন
হাসি মুখে কর বিদায়ের আয়োজন
যুদ্ধ শেষ হলেই
ফিরব আমি তোমার কাছে
যুদ্ধতো এখন শেষ
কবে আসবে তুমি?
তোমার প্রতীক্ষার কবে হবে অবসান?
এখন মধ্যরাত, তোমার চোখে ঘুম নেই
মধ্যরাতের মিষ্টি মিষ্টি বাতাস
চোখেমুখে এসে লাগে।
চাঁদ আর তারা আকাশে জ্বলে,
আকাশের নীল আলোয় আর প্লাবিত জ্যোৎস্নায় -
তোমার মুখ বার বার দেখা যায়।
ছিল সেদিন বসন্ত উৎসব
মেতে উঠেছে সকলে মহা আনন্দে
জানলা দিয়ে দেখছি আর মনে পড়ছে
পুরোনো সঞ্চিত কত বিজরিত স্মৃতি
হঠাৎ আমার শরীর শিহরিত হয়ে উঠল
কার স্পর্শে ?
কে? কে তুমি?
উত্তরে মাত্র একটি শব্দ একটি ধ্বনি
আমি
তুমি

আমার শরীর আনন্দে, আবেগে, উল্লাসে, অভিমানে
ব্যাকুল হয়ে উঠল
রোমাঞ্চিত হাতের রোম
আমার চোখ বুজে গেল লজ্জায়
সে বলল চোখ মেলো প্রিয়া
ভালোবাসার এই সুন্দর পবিত্র মুহূর্তে
তুমি দেখবে না তোমার বীর প্রেমিক কে?
বাসবে না ভালো আমাকে?
ভয় রেখোনা কোন মনে –
বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না আর কেউ তোমাকে
আমার কাছ থেকে।
গ্রহণ কর আমাকে –
আমাকে দাও তোমার স্বামী হবার মর্যাদা
তোমার সিঁথিতে আমি
ভরিয়ে দেব লাল সিঁদুরের স্বীকৃতি।
পড়েছি বাংলাতে “জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।”
তোমাকে ভালোবেসে, প্রেমকে ভেবেছি ঈশ্বর
শুধু একটাই কথা যে, ভালোবেসেছি তোমাকে সবার চেয়ে।

*****

মা

শ্রীমতী শাশ্বতী জানা

অন্তহীন মেঘের ফাঁকে ঘন কুয়াশা
ভরা বিকেল বেলায় তোমার মূর্তি যেন কাঁপে,
তোমার সাজানো ঠাকুর ঘরে এখনও
যেন বাজে ঘন্টা, শুনি শাঁখের শব্দ তুলসীতলায়
জ্বলে সাঁঝের প্রদীপ
রান্না ঘরে গেলে, ভেসে ওঠে তোমার ছবি
আলু থালু চুলে খোপা জড়ানো
গাছ কোমরে বাঁধা শাড়ীর আঁচলে হলুদের ছোপ্।
মনে পড়ে শীতের দুপুরে তোমার হাত ধরে
কু ঝিক্ ঝিক্ খেলা বা কখনো
আঁকশি ধরে পেয়ারা পাড়া
পৌষালি হাওয়ায় এখন যেন
তোমার হাতের রাঁধা পিঠে পায়েসের গন্ধ পাই।
সেই কবে কত দূর তারার দেশে হারিয়ে গেছ তুমি
তুমি থাকো মা সেখানেই থাকো
সব তারার মাঝে
তোমায় একদিন ঠিক খুঁজে পাবো।

*****

মহিষাসুরমর্দিনী

শ্রীমতী শাশ্বতী জানা

আনন্দময়ীর আগমনে দুলছে কাশের বন
আগমনীর সুরে সুরে মাতলো এই ভুবন
শরতের আকাশেতে সাদা মেঘ ভাসে
শিউলি ফুলের সুবাস নিয়ে পূজোর গন্ধ আসে,
এলেন মা দুর্গতিনাশিনী চার দিনের তরে
তাইতো সবার হৃদয় মন আনন্দে যায় ভরে
সবাই মিলে পূজিব তোমায় হে অসুরদলনী
দাও গো মোদের শক্তি হে শক্তি দায়িনী,
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র অশোক মন্ত্র তব
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র দাও গো জীবন নব,
শুধু চারটি দিনের জন্য নয়, মা থাক
চিরদিনের জন্য
আশা পাবো, ভরসা পাব, মোদের জীবন হবে ধন্য।

*****

ঘুমপর্ব

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

।। ১ ।।

"প্রতি রাতে ঘুম ছেড়ে উঠে আমি
ঘুমন্ত গাছেদের গায়ে নাম লিখে আসি"

ঘুম তো পশমের ঝুরো ঝুরো দানা
যত ঝাড়ি যত ফেলতে চেষ্টা করি
চোখের থেকে মাটির গর্তে
ততই আঁকড়ে ধরে ভিতরে সিঁধোয় আর
তার রোঁয়া সমস্ত শরীর জুড়ে
বুনে দেয় ছড়িয়ে দেয় লালা
প্রতি রাতে আমি ঘুমদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে
উঠে যেতে চেষ্টা করি গাছেদের কাছে
তাদের শরীরে চারচৌকো বাহারী কাচঘেরা
ছোট্ট লণ্ঠন ঝুলিয়ে
সখ্যতা টানবার চেষ্টা করি
কোন কোন রাতে (চাঁদের বমন ক্রিয়া হলে)
নিজের চামড়া খুলে গাছেদের গায়ে
আর গাছের বাকল খুলে নিজের
গায়ে টাঙাবার ইচ্ছা করি
গাছের ডালপালা আমার রক্ত মাংসে আর -
শিরায় শিরায় শিকড়ের ভ্রুন জন্ম দেবার
অদম্য চেষ্টায় আমি গাছেদের শিকড়ে শিকড়ে
এই রক্ত (পোকা থিকথিকে মদের মত এই রক্ত)
এই মানবীজন্মের লাল টোকো রক্ত
ভরে দেওয়ার ইচ্ছা করি
তবু ঘুম জোনাকির ডানা
অন্ধকারে রঙের পরত ছিটাতে ছিটাতে
আমাকে গণ্ডির মধ্যে আনে
প্রথমে নিঙড়ে নিঙড়ে নেয় শাঁস তারপর
ঘাড় মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে ছটফটে পালক ছাড়ায়।

স্বপ্নের ভিতর থেকে গাছেরা ছাই ছোঁড়ে
ধুলোবালি ছোঁড়ে, ঘৃণা ছোঁড়ে যেমন তেমন
আর ছোঁড়ে সহস্র জন্মের অভিশাপ
আমি দু'হাতে তা নিরুপায় লুফে নিই
মটরশুঁটির খোসার মত শির চিড়ে
ফাটাই সার সার সাজানো শূন্যতা।

।। ২ ।।

শূন্যতা বড্ড ছোঁয়াচে
একটুখানি স্পর্শ নিয়েই ফুটতে থাকে টগবগে উল্লাসে
শূন্যতাকে অনায়াসে ভরে নিই হাতের তালুতে
অর্ধতরল গাঢ় সে শরীরে আঙুল ডুবিয়ে দিই
চাবির মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলি
ঘর- দালান- বাক্স- পেঁটরা- খোলামকুচি
আর অদ্ভুত কিছু মুখাবয়ব
এদের কেউ কেউ বাসন্তিকী রঙ কেউ বা পীতাভ
ঈষৎ নরম মুখের সরটুকু তুলে ছেঁকে নিই সারটুকু
আমি এই মুখদের নিয়ে লোফালুফি খেলি
ডানহাতে কমলা কিছুটা ভরাট
বাঁ হাতে পীতাভ কিছু কম বেশী
এভাবে ডান হাত - বাঁ হাত, বাঁ হাত- ডান হাত
ব্যালেন্স করতে করতে কখনো ডাঙা আমি, কখনো কুমীর।

শূন্যতা বড্ড ছোঁয়াচে
একটু খানি সাহস দিলেই বয়ে যায় লম্বা হতে হতে
গাছপরিবারে এতসব শূন্যতা
অন্ধকারে মিলেমিশে থাকে
রোজ রাতে আমি ঘুমদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে
উঠে যাই এইসব গাছেদের কাছে
বাহারী কাচঘেরা চারচৌকো লণ্ঠন
টাঙিয়ে দিই শূন্যতার কাঁধে
এসব মুহূর্তে অন্ধকার ধ্বস্ত হতে হতে
স্তন ঝাপটায় সারারাত ডাকাডাকি করে
রাতশেষে গলে যায় অতীব দুধেল
আমি তাকে আদর করে পাখি বলে ডাকি
তার ধ্বস্ততাকে খামচে খুঁটে মেখে নিই শরীরে
এরপর মোম মোম রোদে
প্রতি রোম থেকে উঁকি দেয় পাতা
আমি যত ছিঁড়ি যত কাটি
তত ডাল বেরতে থাকে ক্রমশ কুঁড়িও,
চলন্ত গাছ আমি আরও সব গাছেদের সাথে
একই সারিতে ঘুমপর্বে ঢুকি
আর অন্ধকার আর শূন্যতা আমাকে
চিবোতে থাকে নিরন্তর . . . নিরন্তর।

সেবা মা

অনামিকা দাস

"দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে সেবা পথে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়।"

"মা" আমার হারিয়ে গেছেন
রক্ষা করতে রেখে গেছেন কালো মায়ের কোল।
শুনেছি, মা হলেন প্রশান্তির নিলয়, নিঃসংকোচ আশ্রয়।
মা - একটি স্নেহ মমতার অমৃতময় ভাণ্ডার।
মান- অভিমান, আদর- আবদার, অনুযোগ- অভিযোগের আধার।
“মাগো” তোমার কন্যার গেরুয়া বসন হয়ত তোমার অচেনা,
তোমার হাতের আদরের স্পর্শ, তা আমারও অচেনা।
সুস্নিগ্ধ স্নেহময়ী কালো মায়ের মূর্তিতে তোমায় খোঁজা।
ছোট্ট মেয়েটির চোখের জল, মায়ের কোল, সকলের না - বোঝা।

গেরুয়া ঘর, গেরুয়া চাদর, গেরুয়া বস্ত্র
এরই মাঝে আজ আমিও "মা"।

জানলার জালির ফাঁকে মাকড়সার ঘর বাঁধা
বাইরে পুকুরের সবুজ জলে মা ও ছানা হাঁস
আর আমার মনের গভীরে স্মৃতির “হাঁস ফাঁস”,
শীর্ণ দেহ , জীর্ণ মন,
চাওয়া না পাওয়ার ভেতর থেকে বেড়ে ওঠা মনের গেরুয়া রঙ।
হিসেব মেলাতে দায়, সত্যিই কি রঙটাকে প্রথমেই ভালবেসেছিলাম?
যখন লাল, নীল, সবুজের ছটা, মাথায় ক্লীপ, ঠোঁটে রঙ

মায়ের হাতে হাত মিলিয়ে ছোট্ট পায়ের এগিয়ে চলা।
নিথর দৃষ্টিতে সাদা চোখের একা আমি আশ্রমের গেরুয়া বারান্দায়।
স্বামীজীর রঙ, সন্ন্যাসীর রঙ –
কখন যেন আমার সত্ত্বায় নিবিড়।
নিঃশব্দে ঝড়া পাতার মত পরিবারের বৃক্ষ থেকে একা নিঃসঙ্গ।
সাথে কালো পাথরের মূর্তিটি আর শ্রী শ্রী মার বাণী।

মনের অগোচরে যখন প্রজাপতির বাস
বাইরে কঠোর গেরুয়ার দেওয়াল।
নিঃশব্দে গিলে ফেলা অহেতুক ভালবাসার ঘ্রাণ।
ছোটো ছোটো মাতৃহারা সন্তানদের কান্না -
মনের কোণে মমতার উদয়। - এই কি তাহলে মাতৃত্ব?
মাতৃত্বের টানে, করুণার আধার,
ফুরিয়ে যায় জীবনের যা চাওয়া পাওয়া, রয়ে যায় গেরুয়া।
গেরুয়া শক্তি আর সেই অসীম শক্তি – "মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"
মন জুড়ে নিবেদিতা – শ্রী শ্রী মা -
"ভালবাসায়" ভরা তুমি
তোমার ভালবাসায় আমাদের মত উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই।
তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি।
সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করেনা।
পারিনি গর্ভধারণ করতে, অথচ নিজের সত্ত্বায় উপলব্ধি করি মাতৃত্ব।
মায়ের শরীরের ঘ্রাণ আজ খুঁজে বেড়াই - এই অনাথ শিশুদের মাঝে।
আমি যে আজ এই আশ্রমেরই এক "সেবা মা"।

* * * * *

নাটকের গল্প

সৈকত মিত্র

নাটক করতে গিয়ে হল কত গল্প
বলবনা সবটুকু, শুনে নাও অল্প।
প্রথমেতে কাকে দেবে কোন সে চরিত্র
সেই নিয়ে জল্পনা চলে দিবারাত্র ।
পাকড়াতে হবে দুটি ভাল ভাল prompter
রাত জেগে script লেখে দম্পতি director
কোন মতে ঠিক হল rehearsal এর date
SMS এ চলে আসে Practice এর update
হবে নাকো আজ কিছু গলা বসা দুর্গার
কালকেও হবে নাকো ছুটি নেই গনশার ।
পুরুতএরে কোন মতে করানো হল রাজি।
বাঙলায় script নয় কাতু চায় ইংরাজি।
মা বলে ডাক দিয়ে গলা ছাড়ে ভৃঙ্গি
প্রতিবেশী ধ্যেয়ে আসে সাথে আরও সঙ্গী।
দল বেঁধে পড়শিকে বোঝানোর চেষ্টা
মারামারি হবে নাগো সাধারন case টা
চিল্লিয়ে হও যদি caught red handed
নাক কেটে কচকচ সেঁটে দেবে band aid ।
আরও আছে নানা মজা হও নাকো afraid
এখনি বলছি নাকো থাক top secret ।

* * * * *

কাণ্ডজ্ঞান

পুণ্যজিৎ গুপ্ত

মহাভারত পড়িয়াছেন? এই কর্মনাশা পুস্তকটিতে একটি অধ্যায় রহিয়াছে। পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসকালে বকরূপী ধর্মরাজের চক্করে পড়িয়াছিলেন এবং ধর্মরাজ চার ভ্রাতাকে নাস্তানাবুদ করার পর যুধিষ্ঠির কেরামতি দেখাইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কেরামতিটি বস্তুতপক্ষে যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞান এবং ন্যায়জ্ঞানের পরীক্ষা। এই জ্ঞানগুলি যুধিষ্ঠিরের যারপরনাই ছিল - তবে তৎপরিমান অভাব ছিল কাণ্ডজ্ঞানের, তার ভুরি ভুরি প্রমান মহাভারতে চক্ষু বুলাইলেই পাওয়া যাইবে।

এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় নাই। বিশেষত দ্রৌপদী উঠিতে বসিতে তাঁহাকে যেভাবে অপদস্থ করিতেন তাহা বুঝিবার মত কাণ্ডজ্ঞান তাঁহার অবশিষ্ট ছিল। সবকথা ব্যাসদেব খুলিয়া লেখেন নাই, সম্ভবত যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অথবা নিতান্ত সহানুভূতিবশতঃও হইতে পারে। এবং সম্ভবত ব্যাসদেবের পরামর্শেই যুধিষ্ঠির দ্বারস্থ হইয়াছিলেন কৃষ্ণের -কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কিত পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রচেষ্টায়। কৃষ্ণ ছিলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের কাণ্ডজ্ঞান এক্সপার্ট। পরবর্তীকালে অবশ্য এই ভারতবর্ষেই লোহিত, শ্বেত, গৈরিক, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা বর্ণের ধ্বজাধারী বহু কর্মযোদ্ধা তাঁহাকে হেলায় টেক্কা মারিয়াছেন।

যাহা হউক যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণ তাঁহাকে কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কে যথাবিধ শিক্ষা দিতে রাজী হইয়াছিলেন এবং এক বৎসরব্যাপী একটি ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করিয়াছিলেন। দক্ষিনা কত লইয়াছিলেন সেকথাও ব্যাসদেব খুলিয়া লেখেন নাই। তবে এই শিক্ষা লওয়ার জন্যে যুধিষ্ঠিরকে সময়মন্ত্রের সাহায্যে পূর্ণ এক বৎসর ১৯৯৯-২০০০ সনের সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষে কাটাইতে হইয়াছিল। বৎসরান্তে কৃষ্ণ একটি পরীক্ষার আয়োজনও করিয়াছিলেন।

পরীক্ষার পটভূমি সেই একইপ্রকার। আস্ফালন দেখাইয়া চার ভ্রাতা ডিগবাজী খাইয়াছেন। বক পুষ্করিণী পাড়ে এক পায়ে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যুধিষ্ঠির গুটি গুটি তৎস্থানে উপস্থিত হইলেন। পরবর্তী কথোপকথন এইরূপ -

যুধিষ্ঠির - ইহারা দেখিতেছি ধরাধামের মায়া প্রায় কাটাইয়া উঠিবার মুখে। প্রভু এই জলে কি মিশাইয়াছেন?

বক - কিছু মিশাই নাই। বিশুদ্ধ কর্পোরেশনের জল, ফিল্টার করা হয় নাই।

যুধিষ্ঠির - বুঝিলাম। অতঃ আমাকে কি করিতে হইবে। সেই বেয়াড়া প্রশ্নগুলির আবার উত্তর দিতে হইবে বোধহয়।

বক - উপলব্ধি যথার্থ। তোমার কাণ্ডজ্ঞানের দেখিতেছি যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির - হেঃ হেঃ। তাহা হইলে পরীক্ষা শুরু করিবেন কি ?

বক - উত্তম। তোমাকে পরীক্ষার নিয়মগুলি প্রথমে অবগত করিয়া দিই। পঞ্চাদশ প্রশ্নের মাধ্যমে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হইবে। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে এক বৎসর ভারতবর্ষে ২০০০ সালে জীবনযাপন করিতে হইবে। কোন উত্তর ভুল হইলে ঐ এক বৎসর কলিকাতা শহরে কাটাইবে।

যুধিষ্ঠির (শিহরিয়া) - প্রভু কোন রফা করা যায় না? মোটামুটি কত হইলে আপনার চলিবে বলিবেন কি? কৃষ্ণকে আমি ম্যানেজ করিয়া লইব।

বক (অধঃস্বরে) - প্রস্তাব মন্দ ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণ বড়ই ধুরন্ধর। পরীক্ষাস্থলে টি. ভি. ক্যামেরা লাগাইয়া রাখিয়াছে। তবে তোমার কাণ্ডজ্ঞানের যা উন্নতি হইয়াছে তাহাতে বৃথা অর্থব্যয় করার প্রয়োজন দেখি না। নিশ্চিন্ত থাক।

(উচ্চঃস্বরে) - ইয়োর টাইম স্টার্টস নাও।

প্রশ্নমালা

বক : ধর্ম কি ?

যুধিষ্ঠির : ছলে বলে কৌশলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করাই প্রকৃত ধর্ম।

বক : সুখ কি ?

যুধিষ্ঠির : অপরের দুর্দশা। যত নিকটজন হইবে ততই অধিক সুখ।

বক : দুঃখ কি?

যুধিষ্ঠির : প্রতিবেশীর যশোবৃদ্ধি, অর্থবৃদ্ধি, সুন্দরী স্ত্রী ইত্যাদি।

বক : ন্যায় কি ?

যুধিষ্ঠির : ডাউরি হইতে বঞ্চিত হইলে স্ত্রী দহন।

বক : অন্যায় কি?

যুধিষ্ঠির : উক্ত কর্মে পুলিশ আদালত ইত্যাদি বিরক্তিকর সংস্থাগুলির হস্তক্ষেপ।

বক : স্বর্গ হইতে উচ্চতর কি ?

যুধিষ্ঠির : কেন্দ্র অথবা রাজ্যমন্ত্রীর সিংহাসন।

বক : পৃথিবী হইতে গুরুতর কি ?

যুধিষ্ঠির : পার্টি (যখন যে পার্টিতে অবস্থিত)

বক : তৃণের হইতে অধিক সংখ্যক কি?

যুধিষ্ঠির : ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দল।

বক : সাফল্য কি ?

যুধিষ্ঠির : সফটওয়্যার কোম্পানীর চাকুরী।

বক : ব্যর্থতা কি ?

যুধিষ্ঠির : ভারতবর্ষের অলিম্পিক প্রচেষ্টা।

বক : জনপ্রিয়তা কি ?

যুধিষ্ঠির : সালমন খান নামক প্রাণীবিশেষ।

বক : কর্তব্য কি ?

যুধিষ্ঠির : স্ত্রীর আব্দার পালন করা। প্রয়োজনে পিতামাতাকে ত্যাগ করা।

বক : সর্বাধিক লঘু কি?

যুধিষ্ঠির : রাজনৈতিক নেতার প্রতিশ্রুতি।

বক : সর্বাধিক বিস্ময়কর কি ?

যুধিষ্ঠির : ভারতবর্ষ বলিয়া দেশ। সেকেন্দর ও সেলুকাস সাক্ষী।

বক : পাপ কি ?

যুধিষ্ঠির : প্রভু, প্যাঁচ কষিবেন না। উক্ত শব্দটি ডিকশনারী বহির্ভূত।

প্রশ্ন শেষ। বক চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন।

অবশেষে বলিলেন - তুমি দেখিতেছি সত্যই ভারতবর্ষের উপযুক্ত কর্ণধার। ততঃ প্রার্থনা কর চার ভ্রাতার মধ্যে কাহার জীবন চাও।

যুধিষ্ঠির কিয়ৎক্ষণ গ্রীবাদেশ চুলকাইলেন। তাহার পর কহিলেন ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি প্রভু? রাজ্য, বিষয় আশয় তথা দ্রৌপদীকে বণ্টন করা যে বড়ই বেদনাদায়ক।

বক : বটে! আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কি হইবে? ভীমার্জুন ব্যতীত জয়লাভ করিতে পারিবে?
যুধিষ্ঠির : প্রয়োজন হইবে না প্রভু। দ্বিতীয় পাশার রণে হস্তিনাপুর জিতিয়া লইব।
বক : শকুনিকে পরাস্ত করিয়া? ইহা তো কাণ্ডজ্ঞানে সম্ভব হইবে না বৎস।
যুধিষ্ঠির : প্রভু আপনি নিতান্তই ব্যাকডেটেড। ম্যাচ ফিক্সিং এর কৌশল কিছুই শোনেন নাই কি? কি হইল? অসুস্থ বোধ করিতেছেন? কিঞ্চিত বারি সেবন করিবেন কি?

অন্তরাল হইতে কৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করিলেন। সহাস্যে কহিলেন –'চিন্তা করিও না।' তোমার কাণ্ডজ্ঞানের সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া উনি ভিরমি খাইয়াছেন। কিয়দবকাশে সুস্থ হইবেন। আপাততঃ তুমি এই বিস্মরণবটিকা সেবন কর। যা শিখিয়াছ সব বিস্মৃত হও। নতুবা ব্যাসদেব ভাড়াটে গুন্ডা লাগাইয়া আমাকে বধ করিবেন। তোমার ভ্রাতাগণকে তোমার পশ্চাতে পাঠাইতেছি।

যুধিষ্ঠির বটিকাসেবন করিয়া সব বিস্মৃত হইলেন। গৃহে অবতীর্ণ হইয়া এক বৎসরের অনুপস্থিতির নিমিত্ত দ্রৌপদীর ভালমন্দ শুনিলেন। উত্তরে কি বলিয়াছিলেন সেকথা ব্যাসদেব লেখেন নাই।

* * * * *

নারীর অধিকার

শ্রীমতী শুক্লা দে

যুগ যুগ ধরেই পৃথিবী জুড়ে নারী অবহেলিতা, নিপীড়িতা, নির্যাতিতা। তবে সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা প্রসারের কারণে নারী তার নিজের অধিকার অর্জন করতে শিখেছে বহুদেশেই। তবে শিক্ষার আলো যেখানে পৌঁছাতে পারেনি সেইসব দেশে আজও সমাজে নারীর অবস্থান অপরিবর্তিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজও নারী পুরুষের সেবাদাসী বা ভোগ্যপণ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। অথচ যে নারী সংসারকে পালন করে, রক্ষা করে, পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তার চোখের জলের মূল্য কেউ দেয় না। তাইতো আজও পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই কন্যা ভ্রূণ মৃত্যু বরণ করে মাতৃ গর্ভেই। আর কন্যাসন্তান জন্ম দেবার অপরাধে মাকে অত্যাচারিত হতে হয় আজীবন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী তেত্রিশ কোটি দেবতা পূজিত হন আমাদের দেশে যার অধিকাংশই মাতৃরূপা। অন্যান্য রূপধারী দেবতারাও শক্তিলাভ করেন এই মাতৃ মূর্তির শক্তিতে। অর্থ- ধন- সম্পদ- সুখ- সমৃদ্ধি- জ্ঞান- বিদ্যা, মানুষের জীবনের যা কিছু কামনা বাসনা, মানুষ কিন্তু এই মাতৃরূপা দেবীর কাছেই কৃপা প্রার্থনা করে। আবার সেই মানুষই ঘরে ফিরে দেবীর অংশ স্বরূপা কন্যা- জায়া- মাতাকে অবহেলা করেন, তখন তার মনে একটি বারে জন্যও প্রশ্ন জাগে না যে, সে দেবীর আশীর্ব্বাদ লাভের যোগ্য কিনা। সব নিয়মের যেমন কিছু ব্যতিক্রম আছে, তেমনি কিছু নারী আছে যারা জটিলা-কুটিলা বংশোদ্ভুত। সংসারে তাদের অবস্থান দেবী মহামায়ার লীলাখেলার এক অংশ মাত্র। মায়ার কুয়াশাজাল ছিন্ন করে কতজন আলোর পথে এগিয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র তারই পরীক্ষা। আবার কিছু মহামানবও আছেন যারা সব নারীতেই মাতৃরূপ দর্শন করেন। কিন্তু এই ব্যতিক্রমীদের সংখ্যা এতই নগন্য যে সমাজের চিত্রটা অপরিবর্তিত থেকে যায় যুগ থেকে যুগান্তরে।

হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি ধর্মগ্রন্থ হল রামায়ন ও মহাভারত। আজও হিন্দু ঘরে ঘরে এই দুটি গ্রন্থ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হয়। কাহিনী বিন্যাসের চমৎকারিত্বে তৎকালীন ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির বিশেষত্বে, গভীর জ্ঞান গর্ভ ধর্মতত্ব প্রতিষ্ঠীত করার কারণে এই দুটি মহাকাব্য শুধুমাত্র হিন্দুদের কাছেই নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছেও সমান আকর্ষক ও আদরণীয়। পৃথিবীর নানা দেশের বহু মনিষীরা নিজেদের লিপ্ত করেছেন এই দু'টি গ্রন্থের গবেষণার কাজে এবং বাধ্য হয়েছেন মহাকাব্যের মূল ভাষা সংস্কৃতকে আয়ত্ব করতে।

রামায়ণ এবং মহাভারত এই দু'টি মহাকাব্যের মুখ্য চরিত্রে যে দু'জন নারীকে আমরা দেখতে পাই তাঁরা হলেন সীতা এবং দ্রৌপদী। এত যুগ পরেও বর্তমান সমাজে এই দুটি নারীচরিত্র আজও সমগ্র নারীজাতির প্রতিভূ। অধিকাংশ নারীই হলেন সীতারূপী। সর্বংসহা ধরিত্রীর মতন সংস্কারের ধারক ও বাহক হওয়া সত্বেও পরিবার ও সমাজের অবহেলা ও নিপীড়নের শিকার হন তাঁরা। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে দিতে হয় অগ্নিপরীক্ষা। অথচ সে যুগের অপর একটি নারী দ্রৌপদী চরিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম নারীবাদী চরিত্র যিনি নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সম্মানের সঙ্গে। সীতা এবং দ্রৌপদী দু'জনেই রাজনন্দিনী হওয়া সত্বেও তাঁদের জীবনচক্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন পরিক্রমা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়েছে। দু'জনের কেউই পিতার ঔরসজাত বা মাতার গর্ভজাত সন্তান ছিলেন না। বিদেহ দেশের রাজা জনক সীতাকে লাভ করেছিলেন ভূমি কর্ষণ করবার সময়। তাই তাই কন্যার নাম দেওয়া হয়েছিল সীতা। পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদ কুরুবংশ ধ্বংস করার বাসনায় যে যজ্ঞ করেছিলেন সেই যজ্ঞের আগুন থেকেই দ্রৌপদীর জন্ম। তাই তাঁর অপর নাম যাজ্ঞসেনী। জনক রাজকন্যা জানকী এবং দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদী জন্মলাভ করেছিলেন পিতার ইচ্ছায়। তাই তাঁরা জগতে পরিচিত হয়েছিলেন পিতৃ পরিচয়ে, মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় নয়। সর্বংসহা ধরিত্রীর গর্ভজাত সন্তান সীতা জন্মেছিলেন শিশুকন্যা রূপে এবং রাজা জনকের স্নেহ ভালবাসায় প্রতিপালিত হয়েছিলেন শৈশবে। স্বভাবতই তাঁর

চরিত্রে নারীর সহজাত সমস্ত প্রকার গুণাবলী প্রতিফলিত হতে দেখা যেত। অপর পক্ষে দ্রৌপদীর জন্ম হয়েছিল শিশুকন্যা রূপে নয়, এক প্রাপ্তবয়স্ক নারীরূপে প্রতিহিংসার আগুনের মধ্য থেকে। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি জন্মাবধি কঠোর মানসিকতার প্রতীক ছিলেন।

সীতা এবং দ্রৌপদী যখন বিবাহযোগ্যা হলেন, তখন উভয়েরই বিবাহ হ'লো স্বয়ম্বর সভার মাধ্যমে। অস্ত্র বিদ্যা পরীক্ষায় পারদর্শিতার সাফল্যে শ্রীরামচন্দ্র লাভ করলেন সীতাকে পত্নী রূপে। আর তৃতীয় পাণ্ডব মহাধনুর্ধর অর্জুন জয় করলেন দৌপদীকে। কিন্তু এঁদের কেউই বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন না। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতাররূপে জন্মেছিলেন রামচন্দ্র এবং বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী জন্ম নিলেন সীতারূপে। উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসা এবং বিশ্বাস ছিল প্রশ্নাতীত। তবু তাঁদের দাম্পত্য সুখ ছিল বড়ই ক্ষণস্থায়ী। পিতৃসত্য রক্ষার্থে রাম চোদ্দ বছরের জন্যে বনবাসী হলেন। পতিপ্রাণা সীতা তাঁর অনুগামিনী হলেন সংসার সুখ ত্যাগ করে। কুচক্রী রাক্ষসরাজ রাবণের কপটতার শিকার হলেন সরলপ্রানা সীতা। সীতার রূপে মুগ্ধ রাবণ কিন্তু তাঁর কেশাগ্রও করতে পারেন নি। সীতার মতন সতী সাধ্বী দেবীকে স্পর্শ করলে রাবণ ধ্বংস হয়ে যাবেন এই অভিশাপ রাবণ বিস্মৃত হননি। ঘোরতর ভীষন যুদ্ধে রাবণ বধ করে রামচন্দ্র উদ্ধার করলেন সীতাকে।

প্রজাবৎসল রামচন্দ্রের সম্মান রক্ষার্থে নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করতে সীতাকে দিতে হল অগ্নিপরীক্ষা। অগ্নিপরীক্ষায় সীতার পবিত্রতা প্রমাণিত হওয়া সত্বেও, পরপুরুষ দ্বারা অপহৃত হওয়ার অপরাধে রাজ্যবাসী তাঁকে দেশের রানী বলে স্বীকৃতি দিলনা। উপরন্তু প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র বাধ্য হলেন তাঁর প্রানপ্রিয়া জানকীকে নির্বাসনে পাঠাতে। বিনা বাক্যব্যয়ে সমাজের এই অন্যায় বিচার সীতা মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। বিরহিনী সীতার একমাত্র সম্বল রইল স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও বিশ্বাস। নির্বাসনে থাকাকালীন তাঁর দুই পুত্র সন্তান জন্ম নিল। দেশের ভাবী রাজাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করে তিনি বড় করে তুললেন প্রকৃত মায়ের কর্তব্য হিসেবে এবং পরিবার ও দেশের ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে। উপরন্তু তারা যেন পিতার সম্মান রক্ষা করতে পারে। সময়ের সাথে সাথে একদিন সকলেই উপলব্ধি করতে পারলেন সীতার মহিমা এবং অনুতপ্ত হলেন তাঁদের অন্যায় কর্মের জন্যে। তাঁরা সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন মাতৃস্বরূপা সীতাদেবীকে। কিন্তু সময়ের কাজ সময়ে না করলে তার শুভফল পাওয়া যায়না, এ কথা আরো একবার প্রমাণিত হলো। সীতা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে ফিরে গেলেন মা ধরিত্রীর গর্ভে। যদিও তাঁর সন্তান পরবর্তীকালে দেশের রাজা হয়েছিলেন কিন্তু প্রজারা নিজ কর্মদোষে হারালো দেবী লক্ষ্মীকে।

এত যুগ আগেও দ্রৌপদী কিন্তু নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। তাই স্বয়ংবর সভায় মহাবীর কর্ণ কিন্তু প্রবেশাধিকার পাননি কারণ তিনি ছিলেন সূতপুত্র। অবশ্য দ্রৌপদী তখন কর্ণের আসল পরিচয় জানতেন না। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ছিলেন দ্রৌপদীর স্বপ্নের পুরুষ যাকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে পতিগৃহে এসে জানতে পারলেন তিনি একমাত্র অর্জুনের পত্নী নন, পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী যাঁরা প্রত্যেকেই বিবাহিত এবং একাধিক পত্নী বর্তমান। সপত্নীদের মতন তিনি কিন্তু নিজেকে স্বামীদের ভোগ্যবস্তু বা সেবাদাসী বলে মেনে নিলেন না। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সাহসিকতা তাঁকে দিয়েছিল প্রধানা মহিষীর স্বীকৃতি। শুধু তাই নয় পঞ্চস্বামীর প্রত্যেককে তিনি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁকে কাছে পাবার জন্য। স্বামীরাও তাঁর এই নিয়ম নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন যা এক কথায় অভাবনীয়।

ইন্দ্রপ্রস্থে অহঙ্কারী দুর্যোধনকে তিনি ব্যঙ্গোক্তি করলে সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে দুর্যোধন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কপট পাশা খেলায় কৌরবরা পরাজিত করে পাণ্ডবদের সর্বস্বান্ত করেছিলেন। এমনকি দ্রৌপদীকেও তারা বাজি রাখতে বাধ্য করেছিলেন। যুধিষ্ঠির পরাজিত হলে প্রতিহিংসাবশতঃ দুর্যোধন উন্মুক্ত সভাঘরে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করেছিলেন নানাভাবে। তাঁর বস্ত্রহরণ করে তাঁকে চূড়ান্ত অপমানিত করার চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল কৃষ্ণের

কৃপায়। লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী সর্বসমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত তিনি কৌরবের রক্তে তাঁর কেশ ধৌত করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত তিনি কেশসজ্জা করবেন না, উন্মুক্ত রাখবেন। তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় সকলে ভয়ে শিহিরিত হয়ে উঠেছিল। এমনকি রাজা ধৃতরাষ্ট্রও। তিনি বুঝেছিলেন কৌরবদের আকাশে বিনাশের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। তাই তিনি পুত্রদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন পাণ্ডবদের যথাসর্বস্ব ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডাতে পারে? মহাভারতের যুদ্ধে কৌরব বংশ ধ্বংস হ'লো আর দ্রৌপদী তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনে স্বার্থক হলেন।

এহেন নারীবাদী দ্রৌপদীর মনেও কিন্তু দুঃখ ছিল আজীবন। তাঁর স্বামীরা ধার্মিক, বীর এবং সত্যবাদী ছিলেন তবে বিচক্ষণ ছিলেন না। রাজনীতির কূট-কৌশল তাঁদের জানা ছিল না। নিজের স্ত্রীকে পাশা খেলায় বাজি রাখার মতন গর্হিত কাজ তাঁরা করেছিলেন আর দ্রৌপদীকে সভাগৃহে সর্বসমক্ষে অপমানিত হতে দেখেও তাঁর বীর স্বামীরা তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেননি। কৌরব বংশ ধ্বংস হওয়ার পর পাণ্ডবরা দেশের রাজা হলেন। কিন্তু মহাভারতের বিধ্বংসী যুদ্ধে এত মানুষের মৃত্যু তাঁদের রাজ্য জয়ের আনন্দ থেকে বিরত করে রাখল। দ্রৌপদীসহ তাঁরা গেলেন নির্বাসনে। পাঁচ পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া সত্তেও তিনি মাতৃত্বের সুখ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। নির্বাসনকালে অরণ্যে-পর্বতে থাকতে হবে বলে তাঁর শিশুপুত্রদের মায়ের সাহচর্যে রাখা হয়নি। তাঁর পাঁচ পুত্রেরই মৃত্যু হয় দ্রোণাচার্যের পুত্রের হাতে। এই দুঃখও দ্রৌপদীর জীবনে অসীম বেদনা বয়ে এনেছিল। যদিও তাঁকে সীতার মতন অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়নি তবুও তাঁর জীবনে সুখের স্মৃতি বিরল। নির্বাসন কালে হিমালয় পাহাড়ে ভ্রমন করার সময় গভীর খাদে পতিত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় । তখনও তাঁর স্বামীরা তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন নি। কারন ধর্মবীর যুধিষ্ঠির বিশ্বাস করতেন মায়ার বন্ধন ছিন্ন হলেই মানুষ মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করে।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগের পর অতিবাহিত হয়েছে হাজার হাজার বছর। নারীর জীবনে সংঘটিত হয়েছে অনেক পরিবর্তন। স্ত্রী শিক্ষা, নারীর সমানাধিকার, নারীর সপক্ষে অনেক আইনি ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কন্যা ভ্রুণ মৃত্যু বন্ধ করতে মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। শিক্ষার আলোক প্রাপ্তা নারীরা আজ পুরুষের ন্যায় সমাজের সর্বস্তরের কর্মযজ্ঞের সমান অংশীদার। তাঁরা নিজের পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব সমানভাবে পালন করছেন নিপুণতার সঙ্গে। তবুও মনের গভীরে একটা প্রশ্ন বারবার জেগে ওঠে, নারী কি সত্যিই তার প্রাপ্য সম্মান অর্জন করতে পেরেছে জীবনের প্রতিটি স্তরে? কতজন নারী তাঁর নিজের পরিচয়ে সমাজে পরিচিত হয়েছেন? পারিবারিক চাপে কতজন নারী তাঁর প্রতিভার যোগ্য মার্যাদা লাভ করতে পারেন? জীবনে নারীকতটুকু নিরাপদ? নারীকে লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা হতে হচ্ছে শহরে গ্রামে সমাজের সর্বত্র। তবুও আমরা মহাসমারোহে নারীদিবস পালন করি প্রতিবৎসর।

নারীকে তাঁর অবলা রূপ ত্যাগ করে হতে হবে সবলা। একাধারে সীতা ও দ্রৌপদীর মত পালনকর্ত্রী এবং যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্য সম্মানের অধিকারিণী। পুরুষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেকে রক্ষা করার যাবতীয় কৌশল তাকে আয়ত্ব করতে হবে। কন্যা, জায়া বা মাতার পরিচয়ে নয়, নারী তার নিজের পরিচয়ে সমাজে যেদিন সম্মানের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবে, সেদিন হবে তার নারীজন্মের সার্থকতা। একমাত্র নারীই পারে অবক্ষয়ের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে। তারই হাতের ছোঁয়ায় এই পৃথিবীতে নেমে আসবে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি। দেবীর অংশ স্বরূপা নারী সেদিন লাভ করবে তার যোগ্য সম্মান। সেদিন সার্থক হবে নারীদিবস পালন।

অপেক্ষা

দিলীপ কুমার চক্রবর্তী

ছয় সাত বছর আগেকার কথা। মুম্বাই গিয়েছিলাম একটা অফিসের কাজে। ওরলিতে অফিসের কাজ বিকেলের মধ্যেই শেষ হলো। পরের দিন দুপুরে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যাবার ফ্লাইট। কিছু জিনিসপত্র কেনবার জন্য একটা ট্যাক্সি করে দাদারে এসে গেলাম। আমের সীজন্। রাস্তার দুধারে আলফান্সো আম বিক্রি হচ্ছে। লোভ সামলাতে পারলাম না। দরদাম করে এক বাক্স আম কিনলাম। ম্যাডামের অর্ডার অনুযায়ী ফোল্ডিং ছাতা, গাউন ইত্যাদিও কিনলাম। তারপর হোটেলে ফিরে আসার জন্য ট্যাক্সি ধরার জন্য একটু এগোতেই চোখে পড়ল দূর থেকে একজন ভদ্রলোক আসছেন, একটু চেনা চেনা লাগছে। আমার কলেজের সহপাঠী অমরেশ মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক কাছে আসতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল – অমরেশ? 'আরে দিলীপ তুই' বলে জড়িয়ে ধরল আমায় অমরেশ।

যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার পর আমি চলে যাই গুজরাতে আর অমরেশ একটা নামকরা কনসালটিং ফার্মের চাকরি নিয়ে প্রথমে মুম্বাইতে আসে, পরে বেশ কিছুদিন আমেরিকায় ছিল বলে জানি। আমাদের দুজনের পাশ করার পর এই প্রথম দেখা প্রায় পয়ঁত্রিশ বছর পরে। প্রথম প্রথম চিঠির মাধ্যমে কিছুটা যোগাযোগ ছিল, কিন্তু দু তিন বছর পরে তাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। অমরেশ বলল 'চল একটু চা খেতে খেতে গল্প করা যাক'। আমরা দুজন কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। চা আর পাকৌড়া খেতে খেতে পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন শুরু হল। সত্যেনদার ক্যান্টিন, লাইব্রেরী, ঝিল, ঝিলের উপর সাঁকো, তারপরে আর্ট্স্ কলেজ ইত্যাদি।

তবে এখন আর অমরেশ আগেকার মতো ফুর্তিবাজ নয় বলে মনে হল। একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। মনে হল কোথায় একটা চাপা দুঃখ আছে। অমরেশ জিজ্ঞেস করল – 'দিলীপ তুই কোন হোটেলে উঠেছিস?' আমি বান্দ্রার কাছে একটা হোটেলের নাম বললাম। অমরেশ বলল- 'শোন্ , তুই হোটেল থেকে চেক আউট করে নে। আমি তো সান্তাক্রুজে থাকি রাতটা আমার বাড়িতে কাটা। কাল তো শনিবার সুতরাং আমারও অফিসে যাওয়ার তাড়া থাকবে না। তোকে আমি ছেড়ে দেব'। আমি বললাম- 'সেতো মন্দ হয় না, কিন্তু তোর বাড়িতে গিয়ে হঠাৎ উঠবো, তোর বউ ছেলেমেয়েরা অপ্রস্তুতে পড়বেনা?'

'আরে না – আমি তো বাড়িতে একলাই থাকি।'

'তার মানে?'

'মাধবী তো চার বছর আগেই মারা গেছে হঠাত হার্ট ফেল করে।'

'সেকি এতক্ষণ তো বলিস নি। আর তোর ছেলে?'

'সেতো আমেরিকায় এম এস করতে গিয়ে আর ফেরেনি, ওখানেই চাকরি করছে।'

আমার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোনও কথা বেরোল না। ওকে আর রিফিউজ করতে পারলাম না। বললাম, 'তাহলে চল্।' অমরেশ ওর মোবাইল দিয়ে ড্রাইভার কে ফোন করে গাড়িটা রেস্টুরেন্টের কাছে নিয়ে আসতে বল্ল। ওর সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে হোটেল থেকে চেক আউট করে ওর বাড়ি পৌঁছালাম।

অমরেশের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। আর বেশ সুন্দর সাজানো। আমি বললাম – 'বাঃ তোর বাড়িটা তো বেশ সুন্দর।' 'হ্যাঁ এসবই মাধবীর আইডিয়া। পুরো ইনটিরিয়ার ও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছিল। কিন্তু এখন আমি ভালো করে মেন্‌টেন্‌ করতে পারছি না।' অমরেশ একটা ঘর দেখিয়ে বলল, 'তুই এখানে তোর লাগেজ রেখে ফ্রেশ হয়ে নে। আমিও আসছি তারপর আড্ডায় বসা যাবে।' মিনিট দশেকের মধ্যেই দুজনেই পাজামা পাঞ্জাবী পরে ড্রয়িং রুমে এসে বসলাম। অমরেশকে বললাম – 'তোর ছেলে কবে ফিরবে বিদেশ থেকে? ওর এবার বিয়ে দিয়ে দে। তোর সঙ্গে ফোন কথা হয়তো?' অমরেশ বলল - 'হ্যাঁ রে রোজ কথা হয়। অম্বর খুবই ব্রিলিয়ান্ট বুঝলি। এম আই টি তে এম এস এ চান্স পাওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। ওর তো পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি। শীগগিরিই গ্রীন কার্ড পাবে। ওর একজন আমেরিকান গার্ল্‌ফ্রেন্ড আছে। নাম লিন্ডা। খুব ভাল মেয়ে। ওর সঙ্গেও ফোনে কথা হয়।'

আরও কিছুক্ষণ কথার পর অমরেশ বলল – 'চল একটু ড্রিংক করা যাক।' আমি ড্রিংক করিনা শুনে বলল – 'তুই আর মানুষ হলি না। তাহলে তুই কোল্ড ড্রিংকসই খা।' বলে আমাকে একটা গ্লাসে কোল্ড ড্রিংকস দিয়ে নিজে এক পেগ হুইস্কি নিয়ে বসল। ওর চাকরি জীবনের কথা, মাধবীর সঙ্গে প্রেম এবং বিয়ে হবার কথা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে রাত নটা বেজে গেলো। অমরেশ বলল - 'এই দাঁড়া, ডিনারটা অর্ডার দিতে হবে। কাছেই ভালো একটা রেস্টুরেন্ট আছে। বল্‌ কি খাবি?' আমি বললাম – 'তুই যা ভাল বুঝিস অর্ডার দে।' অমরেশ বলল – 'ওদের মাটন বিরিয়ানি আর কাবাব খুব ভালো।' আমি বললাম – 'তাহলে তাই অর্ডার দে।' ও ফোনে অর্ডার দিয়ে দিল। আধঘন্টার মধ্যে খাবার এসে গেলো। খাবার পর অমরেশ বলল – 'তুই এবার শুয়ে পড়তে পারিস। আমিতো অনেক রাত্রে শুই। অফিসের একটা ফাইল দেখতে হবে আর অম্বরের রোজ রাত্রে ফোন আসে ল্যান্ডলাইনে। ওর সঙ্গে কথা না বললে আমার ঘুম হয় না।'

আমি সেদিন টায়ার্ড ছিলাম তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। পরেরদিন অমরেশ আমাকে এয়ারপোর্টে ছেড়ে দিল। ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছে ওকে আর সঙ্গে সঙ্গে ফোন করা হলো না। ভাবলাম ওতো অনেক রাত অব্দি জেগে থাকে একটু বেশী রাতেই ফোন করব। রাত এগারোটা নাগাদ ফোন করলাম। ফোন করার সময় আমার মাথায় একটা দুষ্টুমি করার মতলব এলো। এগারোটা নাগাদ ফোন করলাম। ফোন করার সময় আমার মাথায় একটা দুষ্টুমি করার মতলব এলো। আমি ওর ল্যান্ডলাইনে গলাটা একটু অস্পষ্ট করে যেন দূর থেকে ফোন করছি এইভাবে বললাম 'হ্যালো'। ওইপাশ থেকে অমরেশ বলল –'হ্যালো অম্বর – তুই আজকাল একদম ফোন করিস না সেই তিনমাস আগে একবার করেছিলি। রোজ তোর ফোনের অপেক্ষায় বসে থাকি সারা রাত ধরে। ভালো আছিস তো?' আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। আস্তে আস্তে ফোনের রিসিভারটা রেখে দিলাম।

* * * * *

একটি নারীর দৃষ্টিতে দুই কবি

অনিমা গুপ্ত

আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি নজরুল ইসলাম এই দুই বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও সুরকার সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা প্রকাশ করবার সুযোগ পেলাম। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলছি। ওঁকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি যখন রবীন্দ্রভারতীতে ভর্তি হলাম তখন ওর নাম ছিল 'একাডেমী অফ ডান্স ড্রামা এন্ড মিউজিক'। এই প্রথম আমার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে পা রাখা। আমাদের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন উদয়শংকর। পরে কিছুদিন উনি ক্লাসও নিয়েছিলেন। তখন ওখানে নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়নি। এই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ক্লাস করতে এসে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। সেটা ১৯৫৮ সাল। চোখে পড়লো মস্ত বড় একটি লাল রঙের বাড়ি। বাড়ির সামনেই বেশ বড় একটি ঘাসে ভরা মাঠ। যেটা পরবর্তীকালে স্টুডেন্টদের আড্ডার জায়গা হয়েছিল। মাঠের শেষে ছিল রথীন্দ্র হল। যেখানে নাচের ক্লাস হত। আমার অবাক লাগত এই ভেবে যে, এত বড় বাড়ি কোনও লোকজন নেই। আছে দু-চারটা অফিস ঘর। তাতে কিছু লোক কাজ করত।

জোড়াসাঁকোতে ক্লাসের অবসর সময় আমি এই বাড়িটা ঘুরে দেখতাম। আমার ভারি ভাল লাগত এভাবে ঘুরে দেখতে। নীচের তলার ঘরগুলো ছিল স্যাঁতস্যাঁতে, একটু অন্ধকার। আমার রবীন্দ্র ঠাকুরের ছেলেবেলা পড়া ছিল। আমার সেই জানা কথাগুলোর সাথে এই বাড়ির ঘরগুলো মেলাতে চাইতাম। আমার মনে হত, এইসব ঘরে কবিগুরু ছোট বেলায় ঘুড়ে বেড়াতেন। মাঠের সামনের বড় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভেবেছি, এই বারান্দায় আমাদের ছোট্ট রবিকে লক্ষনরেখা টেনে কোনও কাজের লোক বসিয়ে রাখত। যে ঘরে তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন সেই, ঘরে ঢুকে অনুভব করতাম সেই দিনের কথা। সেদিন মহাপ্রলয় হয়েছিল। শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে ভাবতাম যে, একদিন এই বাড়ি কত কোলাহল মুখর ছিল। কত বিশিষ্ট ব্যক্তির এ বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়েছে। ব্রাহ্ম সমাজের পত্তন ও নতুন যুগের সূচনা ত এই বাড়ি থেকেই। মেয়েদের নতুন ভাবে শাড়ি পরার স্টাইল এই ঠাকুরবাড়ির বউদের কাছ থেকেই পাওয়া। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা কি পাইনি আমরা ঠাকুর বাড়ি থেকে? ঠাকুর বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল দু বছর। কিন্তু পাশ করার পরও আমি প্রায়ই যেতাম। এই ঠাকুরবাড়ি আমার পরম শ্রদ্ধার ছিল। ছোট্ট রবির কবি হওয়ার উত্তরন এই বাড়িতে। যিনি আমাদের সারা ভারতবর্ষের গর্বের মানুষ।

কবির জন্মদিবসের উৎসব জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গনে হত। অতি সুন্দর সমাবেশ। সেদিন খুব ভোরে চলে যেতাম সেখানে। খুব সুন্দর করে সাজানো হত মঞ্চ; সাজানো হত, যে ঘরে রবি ঠাকুর প্রয়াত হয়েছিলেন। দেখতাম মানুষের ঢল। শুনতাম কত গান, কবিতা। গরমের দিন, কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি আসত না। মনটা পরিপূর্ণ হয়ে যেত এক অভূতপূর্ব আনন্দে। আমি অনেক ছোট বয়েস থেকেই রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা পড়েছি। এখনও তা এমন রেখাপাত করে আছে যা কোনও দিন মুছে ফেলার নয়। আমি একজন নারী হয়ে মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে, নারীদের মনের কথা রবীন্দ্রনাথ এত গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর রচনায় নারীদের মর্ম বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গানে শুনি আমার জীবনেরই আকুতি। কবিতায় পাই আমার দুঃখ, যন্ত্রনা ও আনন্দের প্রকাশ। এই কষ্ট, যন্ত্রনা, দুঃখ রবীন্দ্রনাথ একজন পুরুষ হয়েও নিবিড় ভাবে অনুভব করেছিলেন। কিশোরী বয়েস থেকে রবীন্দ্রনাথ পড়ছি। আজও প্রবীন বয়সে ওর লেখা পড়তে এতটুকু খারাপ লাগেনা।

বর্তমানে দেখছি, রবীন্দ্র সঙ্গীত এর সুর পরিবর্তন করে গাইছেন। অকারণে কিছু মিউজিক রাখছেন গানের মধ্যে। চেষ্টা করছেন রবীন্দ্র ব্যান্ড করা যায় কিনা। এটা যে ঘোরতর অন্যায়। উনি যা সৃষ্টি করে গেছেন ঠিক সেই রকমই থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি আমাদের ভারতবর্ষের বিরাট সম্পদ। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তাঁদের কোনও বিখ্যাত গায়কের গানকে অন্যভাবে গাওয়ার স্পর্ধা দেওয়া হয় বলে আমার জানা নেই। আমার পরম সৌভাগ্য যে সুইডেনে বেড়াতে গিয়ে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ওঁকে দেওয়া নোবেল পুরস্কার। ওখানে সাজানো আছে যাদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল সেইসব পদক। আমার মনে হয় আমি যখন মৃত্যুপথযাত্রী হব, তখন তাঁর একটি গান আমার অবশ্য মনে পড়বে –

“জীবন মরনের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।"

রবীন্দ্রনাথকে যেমন আমি চোখে দেখিনি, কিন্তু কাজি নজরুলকে আমি অনেকবার দেখেছি। একই পাড়ায় আমরা থাকতাম। কাজি সাহেবের বড় ছেলে সব্যসাচীর স্ত্রীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। কাজি সাহেবকে দেখার আগে ওর ছবি দেখেছিলাম। এত বড় চোখ আগে কখনো দেখিনি। প্রথম যেদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম, সে কথা আজও মনে পড়ে। ঘরে ঢুকেই দেখি একজন স্বাস্থ্যবান বয়স্ক মানুষ একটি ছোট খাটে বসে আছেন। সামনে কিছু ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে, আর তিনি তা কুচি কুচি করে ছিঁড়ছেন। আমাকে দেখে বড় বড় চোখ করে তাকালেন। আমি এমন ভয় পেয়ে গেলাম যে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে এলাম। পরে অবশ্য অনেকবার গিয়েছি সেই ফ্ল্যাটে। ভেতরে যেতে গেলে ওঁর ঘরের ভেতর দিয়েই যেতে হত। উনি আমাকে বড় বড় চোখে দেখতেন প্রতিবার। তখন ভয় কেটে গেছে। দুঃখ লাগত ওঁর এই পরণতি দেখে। নজরুলের কবিতা ও গান আমার খুব বেশি পড়া ছিলনা। শুনেছিলাম উনি বিদ্রোহী কবি। পরবর্তীকালে ক্রিষ্টেফার রোডে আমাদের পাড়ার সরকার থেকে খুব ঘটা করে ওঁর জন্মদিন পালন করা হত। মঞ্চ ফুলে ফুলে ভরা থাকত। আসতেন বড় বড় সাহিত্যিক ও গায়ক গায়িকা। সারাদিন যাবত শুনতাম। দেখতাম কবি বসে আছেন, চারিপাশে শুধু ফুল আর ফুল। কেউ হয়ত গাইছেন 'লের জলসায় নীরব কেন কবিফু'। কবিকে দেখার জন্যে তখন বিশাল লাইন। তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুজিবর রহমান কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে যান। ওখানেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন।

নজরুল গানের জগতে অবাধ বিচরন করেছেন। এরকম বিভিন্ন ধরনের গান ও কবিতা উনি ছাড়া আর কেউ লেখেনি। ওনার শ্যামা সঙ্গীত আজও জনপ্রিয়। তিনি নিজেও খুব ভালো গান করতে পারতেন। ছোটদের জন্যেও তিনি অনেক জনপ্রিয় গান রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা দূর্গম গিরি কান্তার মরু। এই কবিতাটি শুনলে কার না গায়ে কাঁটা দেয়। দারিদ্র, কবিকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। এই দারিদ্রই ওঁকে মহান করেছে।

বাংলাদেশ চলে যাওয়ার পর উনি কয়েক বছর বেঁচেছিলেন। বাংলাদেশ সরকার ওখানে ওঁকে খুবই ভালভাবে রেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের কবি নীরব ছিলেন, নীরবেই একদিন চলে গেলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ওঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ঢাকা বেড়াতে গিয়ে সেই সমাধির কাছে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। মনে মনে বললাম, তোমার সামনে অনেক বার গিয়েছি, নীরব ছিলে। আজ এখানে চিরকালের জন্য নীরব হয়ে বিশ্রাম করছ। ফুলের আসরে আর তোমায় দেখবনা। আমার প্রনাম নিও।

* * * * *

মায়াবী কাঞ্চনজঙ্ঘা

উত্তম কুমার বণিক

সুপ্রতীকের ঘুমটা সূর্য ওঠার অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছিল। পাহাড়ে এমনিতেই সূর্য উঠতে অনেক বেলা হয়ে যায়। ঘন কুয়াশায় আকাশটা ঢাকা থাকে বলে। গত তিন দিন ধরে সকাল ন'টার আগে সূর্যের আলো দেখাই যেত না। বিগত সন্ধ্যেতে এই ব্যাপারটা নিয়েই ও আলোচনা করছিল ওর স্ত্রী, পাপিয়ার সাথে। তবে কি নিজের অজান্তেই ওর সূর্যোদয় দেখার বাসনাটা মনের মধ্যে গেঁথে গেছিল? আর এই জন্যেই কি ওর ঘুমটা তা'তাড়ি ভেঙ্গে গেছিল? বন্ধুদের থেকে জেনেছিল যে দার্জিলিং ট্যুরিষ্ট লজের প্রায় প্রত্যেকটা ঘর থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায় সুস্পষ্ট ভাবে। বিশেষ করে সূর্যের আলো যখন কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু বিগত তিন ধরে প্রকৃতি দেবী সেটা সম্ভব হতে দেন নি বলে ওদের মনটা একটু উদাস হয়ে ছিল। ওরা কাঞ্চনজঙ্ঘা ফেসিং একটা ডিলুক্স রুম নিয়েছিল যেটার সাথে এটাচড্ ব্যালকনিও ছিল।

সুপ্রতীক মাংকি ক্যাপটা মাথায় দিয়ে আর গায়ে কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে ব্যালকনিতে রাখা চেয়ারটাতে বসে পড়ল ক্যামকর্ডার আর ট্রাইপডটা হাতে নিয়ে। পাপিয়া তখন গভীর নীদ্রায়। ইচ্ছে করেই জাগায় নি ওকে। গতকাল দার্জিলিংএর অনেক গুলো ট্যুরিষ্ট স্পট দেখে বেশ টায়ার্ড হয়ে পড়েছিল ও। ক্রমশ কুয়াশায় ছেয়ে থাকা অদূরের গাছপালা, বাড়ী- ঘর গুলো যেন একটু স্পষ্ট হতে শুরু করল। সুপ্রতীকের মনটা এক অজানা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তবে কি আজ সূর্যোদয় দেখতে পাবে? দূরের পাহাড় গুলোর পার্শ্বরেখা ক্রমশ দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। হাল্কা নীলাভায় ঢাকা পাহাড় গুলোর গায়ে লালচে- সোনালী আভা সুস্পষ্ট হচ্ছিল ক্রমশ। সুপ্রতীক ট্রাইপডের উপর ক্যামেরাটা সাজিয়ে রেখেছিল এইভেবে যে, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রতিভাত হবার ইঙ্গিত পাবা মাত্র ক্যামকর্ডারের রেকর্ড বাটনটা প্রেস করে দেবে ও।

প্রায় ঘন্টা দুই অপেক্ষার পর প্রকৃতি দেবী যেন সুপ্রতীকের উপর প্রসন্ন হলেন। এত অপরূপ দৃশ্য ও যেন আগে কখন দেখেনি! ক্যামকর্ডারটা চালু করে দিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে। ও ঘরে গিয়ে পাপিয়াকে ঘুম থেকে তুলে দিতে চাইল। পাপিয়া চোখ দুটো কচ্‌লে গায়ে কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে বারান্দায় এসে বসল। ওর মনে হচ্ছিল, ও যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে রয়েছে। এরকম দৃশ্য ও আগে কখন দেখেনি। ওরা দুজনে নির্বাক হয়ে গেছিল। আকাশের গায়ে এত রঙের ছটা ওরা এর আগে কখন দেখেনি যে!

সূর্যের কিরণ ক্রমশ তেজ হচ্ছিল। আর তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে আসছিল। পাপিয়া ওর মনের আনন্দ আর উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারছিল না। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সুপ্রতীকের কাঁধে হাত রেখে সরবে বলে উঠল- "হিমালয়ের পর্বতমালার এরকম অপরূপ সৌন্দর্য আমি আগে কখন দেখেনি। এ যে আমার কল্পনাতীত! তুমি আমাকে না জাগালে বড় আপশোস থেকে যেত! একটু আগেও কাঞ্চনজঙ্ঘা কেমন লালচে- সোনালী আভায় নিজের সৌন্দর্যের মায়ায় আমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল, আর এখন সূর্য কিরণের তেজ

বাড়ার সাথে সাথে তুষারে ঢাকা ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্বমহিমায় কেমন ভাস্বর হয়ে উঠেছে!" সুপ্রতীক মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিয়ে বলল- "তুমি জান, হিমালয় পর্বতমালার এই পর্বতশৃঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা ৮, ৫৮৬ মিটার অর্থাৎ ২৮, ১৬৯ ফুট উঁচু! এটি পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ। সত্যিই সার্থক হয়েছে আমাদের দার্জিলিংএ আসাটা।"

বালিশের পাশে রাখা মোবাইলটা বাজতেই ওরা দুজনেই একটু চমকে উঠল। পাপিয়ার ঘরে গিয়ে মোবাইল ফোনটা ধরতে একটু দেরী হয়ে গেছিল। ও প্রান্ত থেকে, ওদের ছোট মেয়ে, স্নিগ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে আসল। "মা, তোমরা কি এখনো ঘুমোচ্ছিলে? সবাই ভাল আছ তো? দার্জিলিংএ ঠাণ্ডা কেমন?" পাপিয়া উৎফুল্ল হয়ে বললেন - "বাপরে বাপ! কতগুলো প্রশ্ন করলি বলত? হ্যাঁ, আমরা দুজনেই ভাল আছি। এখানে সাংঘাতিক ঠাণ্ডা। বোধ হয় পাঁচ- ছয় ডিগ্রী কিম্বা তার থেকে হয়ত কমই হবে। তোর বাবা তো সেই ভোর বেলা থেকেই মুভি ক্যামেরা নিয়ে বারান্দায় বসে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি তুলবে বলে।" একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন - "আজকের দিনটা সত্যিই যেন সার্থক হল। এত অপরূপ দৃশ্য আমি কোনদিন দেখিনি এর আগে। সূর্যের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা যে এত সুন্দর, মনোরম হতে পারে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। তোরা যদি আসতে পারতি, তবে কি না ভালই হত! ভাল আছিস ত সবাই? আমাদের নাতি, পুচ্কু কেমন আছে? আচ্ছা, শোন, তোর বাবা কথা বলবে।"

আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর স্নিগ্ধা ফোনটা ছেড়ে দিল। বছর দুই আগে স্নিগ্ধার বিয়ে হয়েছিল। ওরা মুম্বাইতে থাকে। বড় মেয়ে, সোমার বিয়ে হয়েছিল সাত বছর আগে। ওরা দিল্লীতে থাকে। ওঁদের একমাত্র ছেলে, পীযূষ আজ বছর তিনেক হল নেদারল্যান্ডে ওর কোম্পানী থেকে ডেপুটেশনে রয়েছে। এখনো বিয়ে হয় নি। বছরে শুধু একবারই খ্রিস্টমাসের সময় ছুটি নিয়ে বাড়ীতে আসে দিন পনেরোর জন্য। পাঁচ মাস আগে সুপ্রতীক রিটায়ার করে। রিটায়ার করার পর প্রথম সপ্তাহটা খুব একটা খারাপ লাগে নি ওর। যেন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে অনেকদিন বাদে ছুটির আমেজটা উপোভোগ করছিল! কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারল, কাজ ছাড়া সময় কাটানটা বেশ মুশকিলের। তাই তিন মাস আগে দিন পনেরোর জন্য ছোট মেয়ের বাড়ীতে ঘুরে এসেছিল। ওখান থেকে ওরা দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ছাড়াও আগ্রা, মুসৌরী, দেরাদুন, হৃষিকেশ, হরিদ্বার, ইত্যাদি জায়গাগুলো দেখে এসেছিল।

অবসর প্রাপ্তির পর সুপ্রতীক ঠিক করেছিল যে ওরা দুজনে মিলে ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে দেখবে। চাকরীর সুবাদে ও তবু বেশ কিছু জায়গা পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু পাপিয়া খুব সামান্যই সুযোগ পেয়েছিল। দার্জিলিং সফর শেষ হলে অক্টোবরে বড় মেয়ের কাছে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে ও মুম্বাইয়ের চারিপাশ দেখে আসবে – এরকমই প্লান করে রেখেছে।

সূর্যকিরণের তেজ তীব্র হচ্ছিল। তুষারে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এত সুন্দর শুভ্রতা যেন আগে কখনও দেখেনি ওঁরা। কিন্তু সময় বাড়ার সাথে সাথে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধীরে ধীরে ঝাপসা হতে লাগল। কোথা থেকে মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলল যেন। চারিদিক কুয়াশায় ঢেকে গেল আবার, যেমনটা ভোর বেলায় দেখতে পেয়েছিল। এ এক অদ্ভুত মায়াজাল যেন!

মুভি ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিল সুপ্রতীক, চোখ- মুখ ধুয়ে দাত ব্রাশ করে ওরা বারান্দাটাতে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে চাইল। নিজের অজান্তেই কেমন একটা লোভের আশায় ছিল যেন। যদি আকাশটা আবার পরিস্কার হয়। তবে আবার হয়ত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে স্বমহিমায় দেখতে পাবে। এখানে আসার আগে সকলের কাছ থেকে শুনেছিল যে,

পাহাড়ে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা, সমুদ্রতটে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে অনেক আলাদা। পাহাড়ে চারিপাশ আপাত দৃষ্টিতে ধীর-স্থির মনে হলে কি হবে, সব সময় যেন কথা বলতে থাকে। কখনো বা ঝির ঝিরে বৃষ্টিতে পাহাড় এক মায়াবী রূপ নেয়। আর যখন মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ে, কী অপরূপই না হয়ে ওঠে পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ। গত পরশু দিন ওরা পাহাড়ের এই মায়াবী রূপ চাক্ষুষ করতে পেরেছিল ম্যালে ঘুরতে গিয়ে। অনেকক্ষণ আটকে পরেছিল ওখানকার একটা রেষ্টেরুন্টে লাঞ্চ করার সময়।

হঠাৎই কোথা থেকে কালো মেঘ চারিদিক ছেয়ে ফেলল। সামান্য দূরের গাছপালা, বাড়ী-ঘর, সব কিছু কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেল। এরকম রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে পাপিয়া নিজের উত্তেজনা দমন করতে পারল না। বলল – "আজ সাংঘাতিক বৃষ্টি হবে, দেখে নিও। আমি চা বানিয়ে আনছি। আজ ব্যালকনিতে বসে এই বৃষ্টিটা উপভোগ করতে হবে।" কথাটা বলেই বেড্‌রুমে রাখা ইলেক্ট্রিক কেট্‌লিটাতে মাপ করে জল দিয়ে সুইচ্‌টা অন্‌ করে দিল। জল গরম হয়ে যাবার পর দটো কাপে ঢেলে টি ব্যাগ গরম জলে ডুবিয়ে দিয়ে একটা ট্রেতে করে বিস্কিটের প্যাকেটটা সাথে নিয়ে বারান্দায় রাখা ছোট্ট গোল টেবলটার উপর রাখল ট্রে-টা।

পাপিয়ার ভবিষ্যৎ বাণী ঠিক হল। ঝম ঝমিয়ে বৃষ্টিটা শুরু হয়ে গেল। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুপ্রতীক পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল – "তুমি, একদম ঠিক বলেছ। এই বৃষ্টিটা অনেকক্ষণ ধরেই চলবে বলে মনে হয়। বাইরে বেশ দমকা হাওয়া বইছে। কেমন একটা শোঁ শোঁ করে আওয়াজ হচ্ছে। যেন গা ছম্‌ ছম্‌ করা আওয়াজ!" পাপিয়া নালিশের সুরে বলে উঠল – "তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ? আমি অত ছোটটি নেই যে, তোমার কথায় শিহরিত হয়ে পড়ব।" সুপ্রতীক, পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসল। কোন উত্তর দিল না।

ঠাণ্ডাটা ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছিল। বাতাসে বয়ে আনা বৃষ্টির জলকণাগুলো ওদের সর্দি লাগাতে পারে বলে ঘরে রাখা চেয়ারে বসে ব্যালকনির দিকে কাচের জানালাটা দিয়ে প্রকৃতির এই অপূর্ব রূপ দর্শন করা সমীচীন মনে করল ওরা। ঘর থেকে ব্যালকনিতে যাবার দরজাটা বন্ধ করে দিল। ওরা দুজনে অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতিকে উপভোগ করছিল। কখন যে ঘণ্টা দুই কেটে গেল, ওরা যেন টেরই পেল না। ওরা খুব মুগ্ধ আর বিভোর হয়ে পড়েছিল।

বৃষ্টির তেজ কমে এসেছিল। আর কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি পড়াটা একদমই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আকাশটা মেঘে ঢেকে রইল। চারিদিক একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেল যেন হঠাৎ! বাতাসও যেন আর বইছিল না। শুধু বারান্দার সামনের গাছটার পাতাগুলো থেকে জল বিন্দুগুলো মুক্তোর মত ঝরে পড়ছিল নীচের বাড়ীটার টিনের চালে। আর তাই একটা খুব শ্রুতি মধুর শব্দ তরংগ তৈরী হয়েছিল।

সুপ্রতীক ফোনে ব্রেকফাস্টের অর্ডারটা দিয়েছিল আধা ঘন্টা আগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো প্লেটে ব্রেকফাস্ট নিয়ে হাজির হল একটা নেপালি ছেলে। মাখন লাগান ব্রেড টোষ্ট, ডাবল্‌ ডিমের অমলেট আর ফ্লাস্ক ভর্তি দার্জিলিং এর ফ্লেভারড্‌ চা। ব্রেকফাষ্ট খেতে খেতে পাপিয়া হঠাৎ কৌতুহল প্রকাশ করে বলল – "আচ্ছা, কাঞ্চনজঙ্ঘার নিশ্চয়ই কোন স্থানীয় অর্থ আছে। তুমি জান?" সুপ্রতীক ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম্‌ এর উপর বেশ কিছু বই পড়েছিল। ওর এই বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং লাগাত বরাবর। এখানে আসার আগে ও অনেক তথ্য জেনে নিয়েছিল ইন্টারনেট্‌ ওয়েব সাইট্‌ থেকে এবং ওর ট্যাব্‌লেট্‌টাতে রেখে দিয়েছিল সব প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো।

বিছানায় বালিশের পাশে রাখা ট্যাবলেটটা হাতে করে নিয়ে এসে সুপ্রতীক উত্তর দিল – "যে তথ্যগুলো

পেয়েছিলাম ইন্টারনেট্ ওয়েব সাইট্ থেকে তাতে লেখা রয়েছে যে, কাঞ্চনজঙ্ঘা শব্দটি শুনে তৎসম কাঞ্চন+জঙ্ঘা মনে হলেও আসলে নামটি সম্ভবতঃ স্থানীয় শব্দ 'কাং চেং জেং গা' থেকে এসেছে, যার অর্থ তেনজিং নোরকে তাঁর বই 'ম্যান অফ এভারেষ্ট'-এ লিখেছেন, "তুষারের পাঁচ ধনদৌলত।" এটির পাঁচ ভান্ডারের প্রতিনিধিত্ব করে, স্বর্ণ, রূপা, রত্ন, শস্য এবং পবিত্র পুস্তক।"

পাপিয়া অবাক হয়ে শুনছিল। ওর মোবাইল ফোনটা বাজতেই ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পারল যে পীযূষ ফোন করেছে। খুব খুশী হয়ে বললেন - "হ্যাঁরে বাপ্পা, আজ যে বড় সকাল-সকাল উঠে গেছিস! কেমন আছিস? ... আমরা দুজনে ভাল আছি। আজ জানিস্ আমরা তিন দিন অপেক্ষা করে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলাম! ... এত অপরূপ দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। ... কাঞ্চনজঙ্ঘার এই মনোরম শোভা কোনদিন ভুলতে পারব না। ... ফোন্টা ধর্, বাবার সাথে কথা বল্।" আরও কিছুক্ষণ ওর বাবার সাথে কথা বলে ফোনটা ছেড়ে দিল পীযূষ। পীযূষের ডাক নাম বাপ্পা। স্নিগ্ধার বিয়ের পর বাড়ীটা বেশ খালি হয়ে গেছিল। বছর তিনেক আগেও তবু পীযূষও বাড়ীতে ছিল। স্নিগ্ধার বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ীতে চলে যাবার পর, ওরা প্রথম প্রথম খুবই একাকী বোধ করত। এখন অনেকটা যেন সয়ে গেছে।

গতকাল বড় মেয়ে, সোমা ফোন করেছিল। ওর এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলেটা বড়, 'এল্ কে জি' তে পড়ে। মেয়েটার বয়স মোটে দু বছর। ওদের ইচ্ছে ছিল, বাবা-মায়ের সাথে দার্জিলিংএ বেড়াতে আসে। কিন্তু, ওদের জামাই, কমলের হঠাৎ অফিসিয়াল ট্যুরে সিঙ্গাপুরে যেতে হল বলে, ওদের টিকিটগুলো শেষ মুহূর্তে বাতিল করতে হয়!

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে ওরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। ওরা দার্জিলিং সফর শেষ করে গ্যাংটকে চার দিন থেকে তারপর কলকাতায় ফিরবে। দার্জিলিং থেকে ওরা রওনা দেবে দু'দিন বাদে। ওরা ইচ্ছে করেই এরকম প্লান বানিয়েছিল। অবসর জীবনে অত তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজনই যে নেই! শুধু একটা চিন্তা সুপ্রতীককে একটু অন্যমনস্ক করে রেখেছিল। যদিও দার্জিলিং এ বর্ষাটা আসতে আরও সপ্তাহ দুই বাকি, কিন্তু এরকম মুষল ধারে বৃষ্টি হলে পাহারে হঠাৎ ধসও নামতে পারে। আর সেটা হলে যে ওরা আটকে যেতে পারে দার্জিলিংএ। গ্যাংটকে অল্রেডি ওদের হোটেল বুক করা আছে।

সুপ্রতীককে একটু অন্যমনস্ক দেখে পাপিয়া প্রশ্ন করল -"হঠাৎ এত চুপচাপ হয়ে গেছ যে?" সুপ্রতীক ওর চিন্তা ভাবনার কথা বলল। পাপিয়া ওকে হোটেলটার রিসেপসনে জিজ্ঞাসা করে রাস্তাঘাটের অবস্থা জানার জন্য পরামর্শ দিল। সুপ্রতীকের ভাবনাই যেন ঠিক হল। গ্যাংটকে যাবার দিকের রাস্তার একটা ছোট অংশ গতকাল বিচ্ছিন্ন হয় পাহারে ধস নামায়। রাস্তা রিপেয়ার করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সম্বভতঃ ওদের গ্যাংটকে পৌছাতে কোন অসুবিধে হবে না। ওরা দুজনেই এই খবরটা শুনে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। আর তাই সেকেন্ড রাউন্ড চা পান করার ইচ্ছা প্রকাশ করল সুপ্রতীক।

দার্জিলিংএর পাতা চায়ের ফ্লেভারই আলাদা। সুপ্রতীকের খুবই পছন্দের চা। আধ-কাপ লিকার চা পেলেই ও নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু চেন্নাই তে এরকম চা পাওয়া যে অভাবনীয় ব্যাপার! সেকেন্ড রাউন্ড চা পান করতে করতে ওরা সারা দিনের প্লান নিয়ে চর্চা করতে লাগল। বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গেছিল বেশ কিছুক্ষন, কিন্তু চারিদিক কেমন ঝাপ্সা হয়েছিল। জানালার বাইরে দিয়ে নীচের খাদটা ও চারিপাশ কিছুক্ষন আগেও দেখা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্ট, কিন্তু এখন যেন অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে। ওরা ঠিক করেছিল যে আলো না ফোটা পর্যন্ত হোটেলের এই ঘরেই থেকে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর পাপিয়া হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল সুপ্রতীকের দিকে তাকিয়ে –"তোমার রিটায়ার করার পর বিগত পাঁচ মাস বেশ ভাল ভাবেই কেটে গেল। বেশ বুঝতে পারছি যে, এই বছরটার বাকি দিন গুলোও চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে কেটে যাবে বেশ ভাল ভাবেই। কিন্তু তারপরের দিন গুলো নিয়েই একটু ভাবনা হচ্ছে। বাড়ীতে শুধু আমরা দূটো প্রানীই থাকব বেশীর ভাগ সময়। হয়ত ছেলে-মেয়েরা, অন্য আত্মীয়-স্বজনরাও আসবে আমাদের বাড়ীতে কখন-সখন, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই আমাদের দুজনকে এই ভাবেই থাকতে হবে!"

সুপ্রতীক পাপিয়ার কথা শুনে শুধু একটু মৃদু হাসল। ওর হঠাৎ একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের গানের কলি মনে পড়ল আর তাই গুন গুন করতে লাগল –"এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক না ... ।" পাপিয়া কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বলল – "আমার সঙ্গে মস্করা করছ। পারবে, তুমি এরকম করে থাকতে, বাকি জীবনটা?" সুপ্রতীক আবহাওয়াটা শান্ত করার জন্য বলল – "মিথ্যে বলব না যে, আমার তোমার মত ভাবানা একদমই হয় না। কিন্তু যা আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে নেই তা' নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করার কোন মানেই হয় না। এই তো বেশ আছি। এরকম করে ঘুরে-বেড়াব, মনে আনন্দ নিয়ে, যত দিন শরীরে কুলোবে।" পাপিয়া প্রত্যুত্তরে বলল –"থামলে কেন? এবার বুঝতে পারছ তো, এমনি করেই বাকি জীবনটা কাটান খুবই কষ্টকর।" সুপ্রতীক কোন উত্তর দিল না। ও খুব বঝতে পারছিল, পাপিয়ার মনের দুঃখটা। সারাটা জীবন কেটে গেল শুধু ছেলে-মেয়ে মানুষ করতে, তাদেরকে স্বনির্ভর করতে, সংসারী করতে। আর এখন এই শেষ বয়সে এসে ছেলে-মেয়েদের কাছে না পাওয়ার বেদনা যে খুবই মনঃপীড়াদায়ক।

আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হয়েই রইল সেদিন। মেঘ কাটবার কোন সম্ভাবনাই বোঝা যাচ্ছিল না। বরং চারিপাশ যেন আরও অন্ধকার হয়ে আসছিল। খুবই ঝাপসা, সামান্য দূরের জিনিসও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। যেন দিনের বেলাতেই সন্ধ্যের বার্তা বয়ে এনেছিল প্রকৃতি দেবী! আর তাই বিকেল পর্যন্ত একই আবহাওয়া থাকায় ওরা দুজনে হোটেলের ওই ঘরটাতেই বন্দী হয়ে রইল। দুজনের কতই বা কথা থাকতে পারে। চারিদিকে একটু আলো থাকলে, তবু না হয় হোটেলটার এই বারান্দা থেকেই চারিদিক পর্যবেক্ষণ করেই কাটিয়ে দিত পারত ওরা, কিন্ত তা হবার কোনই ইঙ্গিত পেল না ওরা প্রকৃতি দেবীর কাছ থেকে। দুপুরে লাঞ্চ সেরে ওরা ঘুমিয়ে নেওয়াই ঠিক করল।

পাপিয়ার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলেই একটু হতাশ হয়ে পড়ল। চারিদিকের সেই ঝাপসা ভাবটা অত বেলাতেও রয়ে গেছিল। ও আপন মনে নিজেকে প্রশ্ন করতে চাইল – 'আকাশের গোমড়া মুখ কি আজ আর কাটবে না? আর এই জন্য কাঞ্চনজংঘাকে আজ মেঘের আড়ালেই লুকিয়ে থাকতে হবে? তবে কি আকাশের এই জমাটি অভিমান কান্না হয়ে না নামলে কাঞ্চনজংঘাকে আজ আর দেখতে পাব না?'

পাপিয়ার প্রার্থনা যেন শুনতে পেয়েছিল প্রকৃতি দেবী। ক্রমশঃ আকাশটা পরিস্কার হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশটা মেঘ মুক্ত হয়ে গেল যেন! এত সুন্দর নীল আকাশ ও যেন আগে কখন দেখেনি। ও আনন্দে সুপ্রতীককে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বলল –"দেখ, দেখ, আবার কাঞ্চনজংঘা দেখা যাচ্ছে! পরন্ত বেলায় তির্যক হয়ে পড়া সূর্যকিরণে বরফে ঢাকা কাঞ্চনজংঘা এক অপূর্ব মহিমায় সম্পূর্ন অন্যরূপে ধরা দিয়েছে যেন! কাঞ্চনজংঘা যেন মায়াবী। কখন যে মেঘের অন্তরালে থাকবে, কখন যে প্রতিভাত হবে নানা রূপে, নানা বর্ণে, তা যেন সাধারন মানুষের বোধগম্যের বাইরে।"

সুপ্রতীক বিস্ফারিত চোখে কাঞ্চনজংঘার ওই অবর্ণনীয় রূপ দেখে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বেলা গড়িয়ে চলল। ওরা দুজনে কাঞ্চনজংঘার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। প্রকৃতির এরকম মায়াবী রূপ ওরা যেন এর আগে কখন দেখেনি! সেই ভোর বেলা থেকে অপরাহ্ন পর্যন্ত কাঞ্চনজংঘার কত মনোরম রূপই না ওরা দেখতে পেল। ওদের দার্জিলিং এর সফরটা যে খুবই সার্থক হয়েছে তা' ওরা বুঝতে পারল। আর তাই প্রকৃতি দেবীর কাছে নিজেদের কৃতজ্ঞতা বোধ অব্যক্ত ভাষায় যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল। তাই তো ওরা প্রকৃতি দেবীকে বিহ্বল দৃষ্টিতে অপলক দেখছিল! ধীরে ধীরে পরন্ত বেলায় চারিদিক আবার অস্পষ্ট হতে শুরু করল। নীলাকাশ রক্তিমাভ হয়ে উঠল।

পাপিয়া সুপ্রতীককে নীরব দেখে প্রশ্ন করল – "কি এত ভাবছ, বলত?" সুপ্রতীক স্মিত হাস্যে উত্তর দিল – "আজকের এই সারাটা দিনের ঘটনার সাথে কতই না মিল মানুষের জীবনের। কত জোয়ার- ভাটা, সুখ- দুঃখের মধ্য দিয়েই না মানুষকে জীবনের পথ অতিক্রম করতে হয়। কত- শত সমস্যা- দ্বিধার সম্মুখীন হতে হয়। আর মানুষকেই তার সমাধান নিজেকেই করতে হয়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে না চললে যে অনেক পিছিয়ে পড়তে হবে। হতাশার স্বীকার হতে হবে যে না হলে! আজ জীবনের এই অপরাহ্ন বেলায় এসে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। চলাই জীবন। প্রয়োজন হলে একাই চলতে হবে যে! পার্থিব জীবনের মায়া- মোহ, আশা- আকাংখা কাটিয়ে উঠতে হবে। তবেই বোধ হয় আমরা অনেক সুখে আর শান্তিতে থাকতে পারব। প্রত্যাশার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ না করাই ভাল। ওতে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। সত্যিই, প্রকৃতি থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।"

পাপিয়া ওর মনের ভাব কিছুটা বুঝতে পারল। আর তাই বলল – "আমি তোমার কথার পুরোটা মানে বুঝতে না পারলেও কিছুটা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আমি জানি, আমাদের এই শেষ জীবনটাতে হয়ত এমনি ভাবেই কাটিয়ে দিতে হবে, পরিবারের বাকি সবাই হয়ত সব সময় কাছে থাকবে না, হয়ত অনেক দূরেই রয়ে যাবে। তাইতো অপ্রয়োজনীয় প্রত্যাশা না করাই ভাল। সেটা পূরণ না হলে যে নিজের দুঃখ- ব্যাথা- বেদনা বাড়বে!"

সুপ্রতীক কোন উত্তর দিল না। শুধু একটু হাসল। রবীন্দ্রনাথের ওই গানের কলিটা ওর মনে পড়ে গেল – "এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক না ... "। পাপিয়া যেন বুঝতে পেরেছিল ওর মনের ভাব। আর তাই ওই গানটাই গাইতে লাগল মৃদুস্বরে।

* * * * *

টিকটিকি

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

।। ১ ।।

তনুময় আগে বোঝেনি যে ব্যাপারটা এমন হবে। জীবটাকে সে বরাবর ঘেন্না করে। ঘেন্না করার মতই চেহারাটা। যদিও আগে খুব কাছের থেকে কোনদিন দেখা হয়নি, তবু দূর থেকে দেখলে কেমন যেন স্যাঁতস্যাতে অনুভূতি জাগত। নতুন বিয়ে হয়েছে তনুময়ের। মাত্র ছয় দিন আগে বৌভাত গেছে। রাত এগারোটার সময় শোবার ঘরে এসে মশারী তুলে বিছানায় ঢুকছে প্রতিভা, তনুময় জেগে ছিল। দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে সবে বালিশে মাথা রেখেছে, ঠিক তখনই বৃষ্টিটা জোরে শুরু হল। বাঁ দিকের জানলাটা মশারির ভিতর থেকেই হাত বাড়িয়ে বন্ধ করেছিল সে। খুব সামান্য সময়ের একটা শব্দ কখন শুরু হয়েছিল কখন শেষ হয়েছিল তা তার জানবার কথা নয়। কারণ বৃষ্টি তখন বড্ড বেশি স্বৈরাচারী হয়ে অন্ধকারকে আরও অন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল বন্ধ জানলার ওপাশে। সেই শব্দে অন্যসব শব্দ ডুবে গিয়েছিল। সে সময় মৃত্যুর ওই বিশেষ শব্দটা তনুময় কেন, কারোরই মনযোগ আকর্ষণ করতে পারতো না। পরেরদিন সকালে প্রতিভা জানলাটা খুলতে গিয়ে ভয়ে লাফিয়ে উঠে তনুময়কে জাপ্‌টে ধরল।

- কি হয়েছে এমন করছ কেন ?
- টিকটিকি ...

তনুময় দেখতে পেল ওটাকে। জানলার কপাটটা যেখানে ভাঁজ হয়ে বাইরের আকাশটাকে খুব সহজে আটকাতে পারে টিক্‌টিকিটা ওখানেই চেপ্টে আটকে আছে। ঘেন্না তো বটেই, কেমন একটা শিরশিরে ভয় আর লজ্জা একসঙ্গে কাজ করতে থাকছিল তনুময়ের মধ্যে। ভয় থাকতে পারে কিন্তু লজ্জা কেন? তনুময় নিজেও সেকথা জানেনা। কাঠি দিয়ে সাবধানে মরা টিকটিকিটাকে জানলা থেকে ফেলার চেষ্টা করল সে। মাংসল জীবটা শক্ত হয়ে আটকে থাকার দরুন বেশ টানটান হয়ে আছে। একটু জোরের সঙ্গে খোঁচা দিতে ওটা মেঝেতে পড়ল। তনুময় দেখল কপাটের ভাঁজে কয়েক ফোঁটা কালচে তরল শুকিয়ে আছে। টিকটিকির রক্ত কালো হয়!

।। ২।।

কিছুতেই কালো ফোঁটা ফোঁটা দাগগুলো কপাট থেকে উঠছে না। বাড়ির কাজের মেয়েটা বহুবার মুছেও তুলতে পারেনি।

- ও দাগ তোলা যাবে না দা বাবু। দ্যাখলেন তো কতবার ন্যাতা দিয়ি ঘষলাম। টিকটিকির নক্ত বলি কতা, একবার বসি গেলি আর উটানো যায় না।

আগে এ বাড়িতে অনেকগুলো টিকটিকি দলবেঁধে বাস করত। বিয়ে উপলক্ষে বাড়ি-ঘর নতুন করে রঙ করার সময় সেগুলোকে তাড়ানো হয়েছিল। একমাত্র এ টিকটিকিটাই তনুময়ের ঘরের দেওয়ালের এককোণে বাদামি হয়ে থাকতে শুরু করেছিল। মলত্যাগ করে নতুন রঙ করা দেওয়ালে দাগ করে দেবে অথবা সারাক্ষণ টিক্ টিক্ করে ডেকে কান ঝালাপালা করবে এ ভেবে তনুময় অনেকবার চেষ্টা করেছে ওটাকে নিজের ঘর থেকে তাড়াতে। তাড়া খেয়ে প্রথমে চলে গেলেও বেহায়া টিকটিকিটাকে সে কিছুক্ষণ পরেই আবার ঘরের দেওয়ালে আবিষ্কার করেছে। অফিসের অনিল বেয়ারা টিকটিকি মারবার একটা অদ্ভুত কৌশলের কথা বলেছিল। কতকগুলো আরশোলা পিটিয়ে প্রায় আধমরা করে

একটা নগ্নমুখ কাচের বয়ামের ভেতর রেখে টিকটিকিটা যে দেওয়ালে থাকবে সেদিকের মেঝেতে বা জানলার নীচে সিমেন্ট করা চওড়া জায়গাটায় রাখতে। আধমরা এই কারণেই, টিক্‌টিকিরা কোন মরা প্রাণী ছোঁয় না। দু- একবার ঘা খেয়ে আরশোলাগুলো খোঁড়া ঠ্যাঙে লেংচে লেংচে হাঁটবে আর টিকটিকিটা চোখে চকচকে লোভ মেখে গুঁড়ি গুঁড়ি এগোবে বয়ামের দিকে আর যেই বয়ামের ভেতর ঢুকবে, ব্যস মুখটা বন্ধ করে দাও ঘণ্টাখানেক, হ্যাংলাটা মরে কাঠ হয়ে থাকবে বয়ামের ভেতর। তনুময় ওসব কৌশলের ধার দিয়ে না গিয়ে বেশ কিছুদিন ওটাকে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া দিয়েই বের করত। পরে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তবে টিকটিকিটাও ভদ্র, অন্তত স্বভাবগত ডাক ছেড়ে তনুময়কে কোনদিন বিরক্ত করেনি। শেষপর্যন্ত তনুময়ের অসাবধানতার জন্যেই ওটা ... !!

।। ৩ ।।

প্রতিভার শ্বশুড়বাড়ি একতলা, দোতলা নয় একেবারে তিনতলা। কিন্তু এত অল্প জমিতে বাড়িটা করা যে প্রত্যেক তলায় একটা বড় ও একটা ছোট ঘর আর ছোট্ট বারান্দা সংলগ্ন বাথরুম কোনমতে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে নীচের তলার বাথরুমটা। একতলা থেকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির তলা ঘেঁষে এবং আরও খানিকটা জায়গা নিয়ে ওই বাথরুমের বেড়ে ওঠা। সিঁড়ির নীচের অংশটা জুড়ে একটা বিরাট চৌবাচ্চা সবসময় টাইম কলের জলে টইটুম্বুর। চৌবাচ্চার সরলরেখার সঙ্গে সিঁড়ির ক্রমশ উত্তরনের বিন্দুগুলো মিশে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ সৃষ্টি করেছে। ছোট জানলা দিয়ে আসা আলো আর ছায়া চৌবাচ্চার জলে প্রতিফলিত হয়ে ত্রিভুজের গায়ে খেলা করে বেড়ায়। প্রতিভার ভারী মজা লাগে। সে হাত দিয়ে আলতো করে জল কে নাড়িয়ে দেয়, ঘুম ভেঙ্গে ওঠা ছোট ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে প্রতিভার চুড়ির শব্দ মিশে এক অদ্ভুত সুর তৈরি হয়ে আলো -ছায়ার সঙ্গে সারা বাথরুমে ছড়িয়ে পড়ে দেওয়ালগুলোতে ধাক্কা খেতে খেতে পুনরায় স্তব্ধতায় ফিরে যায়।

তিনটে মেয়ের পরে চতুর্থ তনুময়। এ বাড়ির একমাত্র ছেলে। দিদিদের বিয়ে -থা আগেই হয়ে গেছে। একতলার দুটো ঘরের একটা কিচেন, অন্যটা ডাইনিং রুম। দোতলায় শ্বশুর- শাশুড়ী থাকে। তিনতলাটা আগে তনুময়ের ছিল এখন প্রতিভা এসে তাদের দু' জনের। শ্বশুর- শাশুড়ী বেশী কথা বলেন না। কেবল প্রতিভা বলে নয় কারুর সঙ্গেই বলেন না। আসলে কম কথা বলতেই এঁরা অভ্যস্ত। কিন্তু স্বামী তনুময় কথা বলতে পারলে আর কিছু চায় না। মাত্র তো ক'টা দিন বিয়ে হয়েছে, এ ক'দিনে ছোটবেলার কথা, স্কুল -কলেজ এমনকি অফিস কলিগদের সমস্ত গল্পই প্রায় শেষ করে ফেলেছে তনুময়। আর বারবার বলেছে ওর গলার তিলটার কথা যার রঙ লাল বা কালো নয়, গাঢ় সবুজ। তনুময় মনে করে তিল নাকি গতজন্মের চিহ্ন। প্রতিভা গতজন্মে গাছ ছিল তাই সবুজ তিলটা একটা পাতার চিহ্ন হিসেবে গলায় রয়ে গেছে। তবে এই তিনদিন সে অস্বাভাবিক চুপচাপ হয়ে গেছে। প্রতিভা লক্ষ্য করেছে টিকটিকিটা মরে যাওয়ার পর থেকে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। শোবার সময় ঘনিষ্ঠ হতে হতে বাঁ দিকের জানলায় চোখ পড়ে গেলে প্রতিভাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে জানলার কপাটের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে তাকানো কোন উদাসীর তাকানো কোন উদাসীর তাকানো নয়, কেমন যেন অতৃপ্তি ভরা সে তাকানোতে। তিক্ততাও।

টিক্‌টিকি দেখলে তনুময়ের মধ্যে কেমন একটা ঘেন্না বোধ জেগে ওঠে একথা সে অন্ততঃ পাঁচ বার প্রতিভাকে শুনিয়েছে। কিন্তু কেবল ঘেন্নাই কি, ভয় নয়? ঘেন্না- ভয় ছাড়া টিক্‌টিকি সম্পর্কে আরও কিছু মনে হয় কি তনুময়ের? তা না হলে গতকাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে তাকে আদর করার সময় তনুময়ের গলা দিয়ে কেন ওই অদ্ভুত আওয়াজটা বের হচ্ছিল যা কেবল দেওয়ালে লেপ্‌টে টিক্‌টিকির গলা থেকে শুনেছে প্রতিভা। ভয়টা এলোমেলো শীতের ঢুকে পড়ে প্রতিভাকে দুমড়ে মুচ্‌ড়ে দিচ্ছিল। কোনরকমে তনুময়ের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে তিনতলার বাথরুমে গিয়েছিল বমি করতে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে বাকি রাতটুকু দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি সে।

।। ৪ ।।

সেদিন অফিস থেকে বাড়ির দরজা অবধি সবে পৌঁছেছে তনুময়, ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টিটা আবার নতুন উদ্যমে বড় বড় ফোঁটায় ভেজানো পথে জোরে শব্দ তুলতে থাকল। প্রতিভা একতলার বাথরুমের চৌবাচ্চা, ত্রিভুজ ছাদ আর নিজের গায়ে সাবানের ফেনা দিয়ে বুদ্‌বুদের ত্রিভুজ গড়তে ব্যস্ত। তনুময়ের বাবা-মা মেদিনীপুরের পিসির কাছে গেছে। পরশু ফিরবে। কয়েকবার কলিংবেল পুশ্‌ করে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল বিরক্ত তনুময়। একতলার বাথরুমটাতে কি আছে কে জানে, প্রতিভা একবার ঢুকলে সহজে বেরোতে চায় না। ভিজে সপ্‌সপে শার্ট টাই আর মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে মাথার উপরে বন্ধ দরজার উঁচু অংশে চোখ পড়তে দেখতে পেল ওটাকে। মৃত টিক্‌টকিটার মত বাদামি নয়, পুরোপুরি কালোও নয় বরং দুটোতে মেশানো অদ্ভুত ছোপ ছোপ। কুমিরের মত গড়ন। লাইট্‌পোস্টের আলোয় মাথার দু'পাশে দুটো স্বচ্ছ গভীর এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র স্পষ্ট হয়ে উঠে নিঃশ্বাসের সাথে ওঠা-নামা করছে। গোল চোখ দু'টোয় আলোর টুকরো নড়াচড়া করছে। হৃদপিণ্ডটা যেন হেঁটে হেঁটে গলার কাছে আসছে, পেটের কাছে একটা তীব্র যন্ত্রণাবোধ পাকস্থলী-অগ্ন্যাশয়কে কুঁকড়ে দিচ্ছে কিন্তু তনুময় বুঝতে পারছে তার বাইরের শরীরটা অবশ হয়ে গেছে। ভিষণ ভাবে স্থির বাইরের ফাঁপা ফোলা ছাঁচে ফেলা মাংসের আকার। বাঁ হাত থেকে চ্যাপ্‌টা ব্রিফ্‌কেস্‌টা পড়ে গেছে। রাস্তা থেকে একহাত উঁচু সিমেন্টের লাল সিঁড়ির উপর। এই মুহূর্তে আরও একটা অনুভূতি প্যান্টের পিছন দিকে উঁচু হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তনুময় দেখলো তার ডানহাতটা দরজার মাথার থেকে কিছুটা নিচে নেমে আসা টিক্‌টিকিটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে আচমকা সাঁড়াশির মত টেনে আনল ওটাকে। তারপর পেটের দু'প্রান্তে বেশ খানিকটা চাপ দিয়ে জীবটাকে নিস্তেজ করে তনুময়ের হাঁ হওয়া ঠোঁটের গোলাকার গর্তে ঢুকিয়ে দিল। তনুময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সে টিক্‌টিকির মাথা, ধড় ও লেজটাকে পরমানন্দে চিবিয়ে চলেছে এবং খুব তিতো একটা স্বাদ তার জিভের স্বাদকোরকগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে সমানভাবে।

প্রতিভা দরজা খুলতে তনুময় দেখল প্রতিভার গলার বড়সড় সবজে তিলটা আসলে একটা গোলাকার সবুজ পোকা। যেটা আস্তে আস্তে গলার নরম মাংস খুঁড়ছে। ডানহাতটা এগিয়ে গিয়ে নধর সবুজ পোকাটাকে খামচে ধরল। তারপর তনুময়ের দু'টো ঠোঁট পোকাটার ছট্‌ফটানিকে চেপে ধরে একতলার বারান্দার দেওয়াল বেয়ে বাথরুমের বাল্বের আলোতে চৌবাচ্চার উপরে গেঁথে যাওয়া সমদ্বিবাহু ছায়াতে গিয়ে বসল।

* * * * *

রান্নাঘর

চিকেন ইজিপ্সিয়ান কাবাব

শ্রীমতী দেবযানী (মালা) রায়

উপকরণঃ
চৌকো করে কাটা বোনলেস চিকেন ১০০ গ্রাম, ক্যাপসিকাম -২, ১টা ছোট পিঁয়াজ, ১টা টমেটো,
নুন-লেবু-গোলমরিচ স্বাদমতো, রসুন ১/২ চা চামচ, ১ টেবল স্পুন মার্জারিন, ১টা ডিম, ১ টেবল স্পুন দুধ।

প্রণালীঃ
চিকেনের টুকরো নুন, লেবু, গোলমরিচ, রসুনবাটা দিয়ে ম্যারিনেট করুন। ক্যাপসিকাম, পিঁয়াজ, টমেটো চিকেনের মত কাটুন। স্ক্রুয়ারে গাঁথুন। হালকা করে গ্রিল করুন। এগ ওয়াশ করে নামিয়ে নিন।

স্টিম চিকেন উইদ্ মাশরুম

জয়শ্রী কুন্ডু (রক্ষিত)

উপকরণঃ
৫০০ গ্রাম বোনলেস চিকেনের টুকরো, কর্নফ্লাওয়ার ২/৩ চামচ, পেঁয়াজ ও রসুনের রস ৩/৪ চামচ, সরষের তেল বা সাদা তেল ৪ চামচ, মাশরুম ২৫০ গ্রাম, আদা পেঁয়াজ রসুন বাটা ২ চামচ, টমেটো পিউরি ৩ চামচ, চিনি ও নুন পরিমাণ মতো, ভিনিগার ২ চামচ, ধনেপাতা ও কাঁচালঙ্কা প্রয়োজন মতো।

পদ্ধতিঃ
প্রথমে বোনলেস চিকেন গুলোকে নুন, ভিনিগার, ১ চামচ কর্নফ্লাওয়ার, পেঁয়াজ ও রসুনের রস, লঙ্কাগুঁড়ো ও নুন দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর একটি টিফিন বক্সে তেল মাখিয়ে চিকেনের মিশ্রণটা দিয়ে টিফিন বক্সের মুখ বন্ধ করে প্রেসারে একটুখানি জল দিয়ে ২/৩ টি সিটি দিতে হবে।

এরপর স্টিম চিকেনটিকে একটি পাত্রে তুলে নিতে হবে। স্টিম চিকেন থেকে জল বেরোবে। ওই স্টক টাকে একটি বাটিতে ২ চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ফেটিয়ে রাখতে হবে।

এরপর কড়াইতে তেল দিয়ে তারমধ্যে পেঁয়াজ আদা রসুন বাটা, নুন, চিনি, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। এরপর আগে থেকে গরম জলে ফোটানো মাশরুম দিয়ে ভালো করে নাড়তে হবে। টমেটো পিউরি দিতে হবে। একটু কষানোর পর আগে থেকে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে গুলে রাখা স্টকটা দিয়ে আরও একটু জল দিয়ে চাপা দিতে হবে। মাশরুম সেদ্ধ হয়ে গ্রেভিটা ঘন হয়ে এলে স্টিম চিকেন দিয়ে মিক্সড করে ওপর থেকে ধনে পাতা ও কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে।